যুগে যুগে ঢাকার ঈদমিছিল

রফিকুল ইসলাম রফিক

যুগে যুগে ঢাকার ঈদ মিছিল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যুগে যুগে ঢাকার ঈদমিছিল

রফিকুল ইসলাম রফিক

Centre for Advanced Media
(CAM)
Book No. 69

রিদম প্রকাশনা সংস্থা

www.pathagar.com

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০৪

প্রকাশক
মোঃ গফুর হোসেন
রিদম প্রকাশনা সংস্থা
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
জুবায়েদ হাসান

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

বর্ণ বিন্যাস
কম্প্রিন্ট মিডিয়া এন্ড পাবলিশার্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণ
আল ফয়সাল প্রিন্টার্স
৩৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

JUGA JUGA DHAKAR EID MISEL By : Rafiqul Islam Rafiq Published by Md. Gofur Hossain, Rhythm Prokashona Songstha, 34, North Brook Hall Road, Dhaka-1100 Phone : 01711328720 Date of publication February 2007.
E-mail / rhythm _ prokashona@yahoo.com
Price : Taka125.00 Only. US $ 4
ISBN 984 - 8319 - 99 - 9

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রাক্তন সচিব ও নাট্যকার

সাঈদ আহমদ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ঈদ / ১৯
ইফতার / ২০
কাশিদা / ২২
ঈদের চাদ / ২২
মেহেদি / ২৫
ঈদের নামাজ / ২৬
নামাযের মিছিল বা শোভাযাত্রা / ২৮
ঈদের মেলা / ৩০
অন্যান্য বিনোদন / ৩২
ঈদের পোশাক ও ফ্যাশন শো / ৩৪
ঈদের খাবার ও অতিথি আপ্যায়ন / ৩৪
ঈদুল আযহা / ৩৭
ঈদের ঐতিহাসিক পটভূমি / ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈদ মিছিল: মোগল ও নায়েব নাজিম আমল / ৪১
ঈদ মিছিলের চিত্রমালা / ৪৩
ঈদ মিছিলের অন্তর্ভুক্ত এলাকা / ৪৫
নিমতলী নবাব প্রাসাদ / ৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

ঈদ মিছিল : ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল / ৬৭
ঈদ মিছিল চলার রাস্তা / ৭১
পুরস্কার বিতরণ / ৭৪
একটি মর্মান্তিক ঘটনা / ৭৬

চতুর্থ অধ্যায়

ঈদ মিছিল : বাংলাদেশ আমল / ৮৪
ঈদ মিছিলে হাতি / ৮৭
ঈদ মিছিলের আলোকচিত্র প্রদর্শনী / ৮৯
ঢাকা সমিতি আয়োজিত ঈদের মিছিল / ৮৯
ঢাকা সিটি করপোরেশনে সংবর্ধনা / ৯৪
পুরস্কার বিতরণ / ৯৫
ঈদ মিছিলে পুরস্কারপ্রাপ্ত দল / ৯৮
বিচারকমণ্ডলী / ৯৯
ঈদ মিছিলে অংশগ্রহণকারী এলাকাবাসী ও সংগঠন / ১০১
ঈদ মিছিলে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা / ১০৩
তথ্যসূত্র / ১০৪
পরিশিষ্ট- ১. এক নজরে প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিষয় / ১০৭
পরিশিষ্ট- ২. ঈদ আনন্দ মিছিল নীতিমালা / ১১১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

গত দুম'দশকে ঢাকা চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই উনিশ শতক থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত গুটি কয়েক ইংরেজি রিপোর্ট, বই ও বাংলা বিবরণই ছিল ঢাকা চর্চার উদাহরণ। গত শতকের সত্তর দশকের মাঝামাঝি আবার ঢাকা নিয়ে লেখালেখি শুরু হয় এবং ক্রমেই ঢাকা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এ সমস্ত কিছুই ঢাকা চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করে। যার উদাহরণ ঢাকা নগর জাদুঘর স্থাপন, ঢাকা গ্রন্থমালা শীর্ষক ঢাকা বিষয়ক গ্রন্থের একটি সিরিজ প্রকাশ, ঢাকা সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন, প্রতিবছরই ঢাকা সম্পর্কিত কমপক্ষে একটি বই প্রকাশ ইত্যাদি। ঢাকা চর্চার ধারাবাহিকতায়-ই প্রকাশিত হলো রফিকুল ইসলাম রফিকের যুগে যুগে ঢাকার ঈদ মিছিল।

রফিক ইতিপূর্বে আমার সাথে দেখা করেন একটি ছড়ার বই-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে ভূমিকা রচনার জন্য। রফিকের সেই পাণ্ডুলিপি ১৯৯৯ সালে শিল্পী হাশেম খানের আঁকা প্রচ্ছদ নিয়ে প্রকাশিত হয়। নাম বায়ান্ন বাজার তেপান্ন গলি, শুধু একটি শহর নিয়ে রচিত একটি ছড়ার বই বোধহয় এই প্রথম।

এ বছর রফিক আবার আমাকে অনুরোধ করেছে তাঁর প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় বইটির ভূমিকা লিখে দেয়ার জন্য। এবারের বইটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ। নাম যুগে যুগে ঢাকার ঈদ মিছিল। ঢাকার বিভিন্ন মিছিল নিয়ে যে এর আগে কোন লেখা প্রকাশিত হয়নি তা' নয়। মুঘল আমল থেকে এ পর্যন্ত নানা লেখায় ঈদের মিছিলের বর্ণনা আছে। রফিকের কৃতিত্ব। তিনিই প্রথম বিভিন্ন বিবরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। শুধু একটি শহরের ঈদের মিছিল নিয়ে একটি বই হতে পারে-এই যে উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল চিন্তা এর জন্যই লেখক অভিনন্দিত হতে পারেন।

চারটি অধ্যায় আছে এ গ্রন্থে। প্রথম অধ্যায়ে আছে ঈদ উদ্‌যাপনের বর্ণনা। পটভূমি হিসেবেও এটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত বাকি তিনটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে মুঘল আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঈদ মিছিলের বিবর্তনের ইতিহাস। ঈদ মিছিল এক সময় জাক জমকের সঙ্গে হতো। কিন্তু লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা। কয়েক বছর আগে কয়েকজন উৎসাহি ব্যক্তির উদ্যোগে আবার তা শুরু হয়েছে। লেখক প্রচুর তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশ আমলে ঈদ মিছিল (২০০৩ সাল পর্যন্ত) সম্পর্কে বিস্তারিত (পরিশিষ্টসহ) যা কয়েক দশক পর সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ঢাকার ঈদ মিছিল ছাড়া মহররম ও জন্মাষ্টমীর মিছিলও ছিল বিখ্যাত। আশা করি রফিক এ সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করবেন এবং এ ভাবে সমৃদ্ধ করবেন ঢাকা চর্চাকে।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুনতাসীর মামুন

www.pathagar.com

অভিমত

ঢাকা একটি ঐতিহাসিক নগরী। এই নগরীর ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের এই ভুখণ্ডের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নানা স্বপ্ন কল্পনার চিত্র জড়িয়ে আছে। সেদিক থেকে দেখলে এই নগরীর বিকাশ ধারায় আমাদের জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তব জীবনযাত্রার নানামাত্রিক প্রকাশে কখনো রোমাঞ্চকর কখনো স্মৃতিকাতরতায় অনুপম, কখনো আর্থ-সামাজিক জীবন প্রবাহের ছোঁয়ায় জীবন্ত। সে জন্যই ঢাকা নগরীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিকাশের ধারাটি লেখক, শিল্পী, ভাবুক, চিন্তক ও ঐতিহাসিকদের নানাভাবে উদ্দীপ্ত করে। তরুণ গবেষক রফিকুল ইসলাম রফিকও এদেরই মত একজন ঢাকা প্রেমিক। এই শহরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা তাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই অনুপ্রেরণাটির এক বিশিষ্ট ফসল 'যুগে যুগে ঢাকার ঈদ মিছিল' শীর্ষক এই তাৎপর্যপূর্ণ রচনা।

ঢাকার ঈদের মিছিল ঢাকার জীবনযাত্রার এক প্রাণবন্ত উপাদানকে ধারণ করে। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে এই মিছিল ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে সংগঠিত হয়েছে উদ্দীপ্ত করেছে শহর ঢাকার মানুষকে। ঢাকাবাসীর এক চমৎকার উৎসব ও বিনোদন উপকরণ হিসেবেও এর গুরুত্ব অনন্য। ঢাকার ঈদের মিছিল ইতিহাসের নানাপর্বে বিবর্তিত হয়েছে। এক সময় ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্মাষ্টমীর মিছিল ও মেলা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদের মিছিল ও মেলা ছিল ঢাকার নাগরিক জীবনের সহঅবস্থান, পরস্পরের সম্প্রতি উপভোগ এবং তার মধ্যদিয়ে আনন্দ লাভের এক চমৎকার উদাহরণ। ঢাকার মানুষ বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায় তাদের এই উৎসবটিকে মনের মত করে সাজাতে গিয়ে এতে ঐতিহাসিক উপাদান, সামাজিক জীবনের প্রতিফলন, সমকালীন ঘটনার তীক্ষ্ণ তির্যক প্রক্ষেপণ এবং সমাজ সমালোচনার মাধ্যম হিসেবেও একে বিন্যস্ত করেছে। সেদিক থেকে ঢাকার ঈদের মিছিল ঐতিহাসিকতায় ঋদ্ধ, সামাজিক চেতনায় দীপ্ত এবং বিনোদনময়তায় অনুপম। এ রকম একটি উৎসবের ইতিহাস নির্ভর বর্ণনার মাধ্যমে পুর্নগঠনের প্রয়াসটি অভিনন্দনযোগ্য। লেখক ও গবেষক 'যুগে যুগে ঢাকার ঈদ মিছিল' গ্রন্থে আমাদের ইতিহাস ও সমাজ ভাবনা এবং আনন্দময়তার যে চিত্র অংকন করেছেন তার জন্য লেখককে আমি সাধুবাদ জানাই। আশাকরি বইটি পাঠকদের ভাল লাগবে।

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

শামসুজ্জামান খান

www.pathagar.com

পূর্ব কথন

প্রাচ্যের রহস্য নগরী ঢাকা। উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন শহর। অনেক বিবর্তন ঘটেছে এ নগরীর। তার বিকাশের বিভিন্ন সময়ে অনেক বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হারিয়ে গেছে ইতিহাসের অনেক উপাদান। ঢাকা বর্তমানে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী। এর পূর্বেও ঢাকা তিনবার রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রথমবার মোগল আমলে, দ্বিতীয়বার ব্রিটিশ আমলে এবং তৃতীয়বার পাকিস্তান আমলে। মোট চারবার দীর্ঘদিন রাজধানী থাকার কারণে ঢাকা যেমন গুরুত্ব অর্জন করে। তেমনি অর্থনীতিসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এর উন্নয়ন ঘটে।

একটা দেশের প্রাণকেন্দ্র হলো সে দেশের রাজধানী। সেই সুবাদে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র হলো রাজধানী ঢাকা। বিশ্বের মানচিত্রে আজও ঢাকা তার স্বীয় মর্যাদা অটুট রেখেছে।

ঢাকা আমাদের শিক্ষা, ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, স্বাধীনতা আর সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র। এ শহরকে কেন্দ্র করেই আবহমান বাংলায় সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। এ শহরবাসীর গৌরব এই যে, এটি সৃজনশীল, সদা উদার উন্মুক্ত, বহুভাষিক, বহুজাতিক চমৎকার এক শহর। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাবাসীর মিলনক্ষেত্র ঢাকা শহর। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষও রয়েছে ঢাকার বুকে। ঢাকা সকলকে নিজের বুকে ঠাঁই দিয়ে পরকে আপন করে নিয়েছে। কী মায়া আছে এই শহরের হৃদয়ে? কেমন করে এ রহস্য নগরী মানুষকে আপন করে ফেলে?

এ অঞ্চলে এক সুবৃহৎ জনপদ প্রতিষ্ঠিত ছিল একাদশ শতকের শেষের দিকে। বিশ্বের প্রধান জনবহুল শহরগুলোর অন্যতম ছিল তখন ঢাকা। সে সময় ঢাকা শহরের জনসংখ্যার প্রায় সম্পূর্ণই স্থানীয় ছিল। ঢাকায় ১৬৪০ সালে স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যা ২ লক্ষ ছিল।

ঢাকায় মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল সুলতানী আমলে। ইসলাম খাঁ চিশতী ১৬০৮ খৃস্টাব্দে ঢাকাকে রাজধানী করায় রাজকীয় কৃষ্টি এ শহরের জনজীবনে আরও উৎকর্ষতা লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও চারুকলা, সঙ্গীত ও নগরায়নে স্থাপত্য প্রতিষ্ঠা, শিল্প, চারুকলা, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা, চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোগল সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে। ঢাকা মোগল আমলে দুনিয়ার বারটি খ্যাতিমান শহরগুলোর অন্যতম ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, আচার ব্যবহার, রঙ্গ রসিকতা এবং সামাজিক জীবনধারার একটি নিজস্ব রীতি নিয়ে গড়ে উঠেছে ঢাকা। উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন শহর আগ্রা ও দিল্লীর সাথে ঢাকার সংস্কৃতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কলকাতার সাথে নয়। কলকাতা ঢাকার চেয়ে অনেক কনিষ্ঠতর শহর।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের খ্যাতিমান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ হাকীম হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন ঢাকার সমাজ ব্যবস্থা ও তহযীব তমদ্দুন মূলত আগ্রারই সমাজ ব্যবস্থা ও তথাকার তহযীব তমদ্দুন। কিন্তু এই সমাজ কাঠামোতে ইরানীদের আধুনিক তমদ্দুন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।[১] তখনকার ঢাকা শহরের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন। এর রেশ আজও ঢাকা শহর থেকে হারিয়ে যায়নি।

ঢাকা শহরের অন্যতম আকর্ষণ এর পাশ দিয়ে বহমান বুড়িগঙ্গা নদী। নদীর তীর থেকে ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল। সেখানে বসবাস করতেন মোগল নবাব ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। সে সময়ে নদীর তীর ছিল একটি পর্যটন ও স্বাস্থ্যকর স্থান। পটোম্যাক নদীকে জড়িয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি। টেমস নদী হল লণ্ডনের প্রাণ। সেইন নদীর পাশে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস। যমুনা নদীর তীরে মোগল সম্রাট গড়ে তুলেছিলেন তাজমহল। মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁ চিশতী বুড়িগঙ্গার তীরে এখানকার নয়নাভিরাম স্থান দেখে গড়েছিলেন রাজধানী ঢাকা। বুড়িগঙ্গায় ভাসতো তখন মোগলের রাজকীয় নৌবহর। জেমস টেলর- নদী তীরের ঢাকা শহরকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন বর্ষাকালে নদীটি বেশ প্রশস্ত হয় এবং মিনার ও বৃহ্য অট্টালিকা শোভিত ঢাকা নগরী তখন পাশ্চাত্যের ভেনিসের ন্যায় জলোম্থিত নগরী বলে প্রতীয়মান হয়।[২] ১৮৪০ সালে এক শিল্পী বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত বাড়িগুলির চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন। ঢাকা শহরের সাথে বুড়িগঙ্গার অস্তিত্বের প্রশ্নটি প্রায় অভিন্ন। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বুড়িগঙ্গা ঢাকা শহরকে আগলে রেখেছে তার বুকে। ঢাকার হাল কি হবে বুড়িগঙ্গা বাঁচাতে না পারলে ১৮৬১ সালে প্রকাশিত "ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকায় বুড়িগঙ্গার পানির ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের কথা অনেকবার লেখা হয়েছে। ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ সালে বুড়ীগঙ্গা সম্বন্ধে ডাক্তার বিটসন ও কমিশনার সাহেবের রিপোর্টেও ভয়াবহতার কথা উল্লেখিত হয়েছে।[৩] আজও এর প্রতিকার হয়নি। কিন্তু কেন গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে বুড়িগঙ্গাকে?

ঢাকার অধিবাসীরা বহু পূর্ব থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে উৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। পুরানো ঢাকার প্রাচীন স্কুল-কলেজের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি ঢাকাবাসী শিক্ষা ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রসর ছিলেন। ঢাকাবাসী ছাড়াও এসব স্কুল-কলেজে বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্ররা এসে পড়াশুনা করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রেখে চলেছেন। বিদেশী পর্যটক মিঃ টাভেনিয়ার, সেঙচী, জনসিলভিয়া, ফাহিয়েন, টমাস বাউরী সেবাস্তিয়ান মানরিক, উইলিয়াম হান্টার প্রমুখ ঢাকার ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সম্পদ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন– "উচ্ছল প্রাণবন্ত ঐশ্বর্যশালী ঢাকা ও পূর্ব বাংলাকে শোষণ এবং লুণ্ঠন করে ইংরেজরা কলকাতা ও ইংল্যাণ্ডকে সমৃদ্ধ করেছে মাত্র।[৪] অতিউন্নত, ক্ষমতাবান এবং একটি সমৃদ্ধ, মোগল রাজধানী হয়ে

www.pathagar.com

ঢাকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কালো থাবায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শহরটি তার পূর্বের গৌরব ফিরে পায়।

নবাব শায়েস্তা খাঁর সময় এ শহর শিল্প, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। সে সময়কার বিদেশী পর্যটক থমাস বাউরি এ শহর পরিভ্রমণ করে লিখেছেন ঢাকা শহর চমৎকার দালান কোঠা এবং বিচিত্র বাসিন্দাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে। এখানে একটি বিরাট সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছে। যুদ্ধের জন্য এখানে সুদক্ষ অশ্ব ও হস্তী বহর সদা প্রস্তুত ছিল।[৫]

ব্রিটিশ আমলের ঢাকার কালেক্টর ও খ্যাতিমান চিত্রকর চার্লস ডয়লী এ শহর সম্পর্কে লিখেছেন, ভারতবর্ষে যতগুলি সুন্দর স্থান আছে ঢাকা তার অন্যতম। আবহাওয়া অত্যন্ত চমৎকার। বাজারে প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বিলাস সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায়। প্রতিটি দ্রব্য অতি উৎকৃষ্টমানের। এই জন্য শহর হিসাবে ঢাকা এখন ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং উন্নত।[৬]

ঢাকার অধিবাসীদের আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য, পাশাপাশি ঢাকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যুগে যুগে দেশী-বিদেশীদের আকৃষ্ট করেছে। এ শহর সকল জেলার মানুষকে প্রাচীনকাল থেকেই আপন করে নিয়েছে। সবাই আকর্ষণ বোধ করতো ঢাকার প্রতি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক নবীনচন্দ্র সেন জানিয়েছেন, 'ঢাকা পূর্ব রাজধানীর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্বত্র সম্মানিত এবং ভদ্রস্থান। এত শিক্ষিত ও সুসম্পন্ন লোক পূর্ববঙ্গের অন্য কোনও নগরে নাই।[৭]

বিগত কয়েক বছর পূর্বে এক জাপানী মহিলা চিত্রশিল্পী ঢাকা শহর ভ্রমণে এসেছিলেন। পুরানো ঢাকার স্থাপত্য শিল্প ও সংস্কৃতি তাকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি দ্বিতীয়বার এসেছিলেন ১৯৯৭ সালে। সে বছর চারুকলা ইনষ্টিটিউটের আর্ট গ্যালারীতে পঁচিশ বছর বয়সী জাপানী চিত্রশিল্পী সানায়ে ওয়াতানাবের "স্মৃতিময় ঢাকা" নামে পুরানো ঢাকা নিয়ে প্রায় ৩০টির মত চিত্রশিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মানুষ দেখে বিস্মিত হয়েছে এ চমৎকার শিল্পকর্ম। তিনি ঢাকা শহরকে যে চোখে দেখেছেন তারই প্রতিফলন ঘটেছিল তার চিত্রশিল্পে। শিল্পী রফি হককে শিল্পী ওয়াতানাব সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম এবং অন্যান্যভাবে জ্ঞাত ধারণা থেকে এদেশটিকে বরাবরই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিপন্ন মানুষের হাহাকার পশ্চাদপদ অর্থনীতি ও সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতায় জর্জরিত বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রত্যক্ষ করলাম এতসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এখানকার মানুষের অকৃত্রিম আন্তরিকতা এবং উন্নত সংস্কৃতির প্রকাশ ঢাকার জীবন যাত্রার অনেকাংশেই আন্দোলিত করেছে। ঘুরে বেড়ালাম পুরানো ঢাকার অলি-গলি। আর উন্মোচিত হতে থাকলো বাস্তবের ঢাকা নগরী। আকৃষ্ট হতে থাকলাম একের পর এক অজানা অভিজ্ঞতার প্রতি।

www.pathagar.com

এরই মধ্যে স্বদেশে (জাপানে) ফিরে যাবার সময় হয়ে এল। ফিরেও গেলাম তবে নিয়ে গেলাম স্মৃতিময় নানা বর্ণের অভিজ্ঞতা। ক্যানভাসে (CANVAS) তুলে আনবার তাগিদ অনুভব করলাম। লেগে গেলাম স্মৃতিময় ঢাকাকে জাপানের নিজ ষ্টুডিওতে বসে নানান বর্ণময়তায় বর্ণিত করতে। গত এক বছরে স্মৃতিময় ঢাকার খণ্ডচিত্রগুলোকে আমার উপলব্ধি দিয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টা এবং অনুভূতি উপলব্ধির আমার নিজস্ব প্রকাশ (Memory of Dhaka) নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের আবেগ অনুভূতির সঙ্গে একান্ত হতে।[৮]

দৈনিক ইনকিলাবের সাক্ষাৎকারে ওয়াতানাব বলেন, জাপানের প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য এখনো ধরে রাখা হয়েছে। কিয়াটো এবং কোবে শহর দুটো ঐতিহ্যের শহর হিসাবে খ্যাতি রয়েছে। প্রাচীন স্মৃতিগুলো সেখানে জীবন্ত করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমাকে কষ্ট দিয়েছে পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যকে নষ্ট করে আধুনিক করে গড়ে তোলার বিষয়টি।[৯] সানায়ে ওয়াতানাবের শিল্পগুলোতে উঠে এসেছে পুরানো ঢাকার অলি-গলি ও স্থাপত্য শৈলী। ঢাকা যখন নানারকম সমস্যায় ও ভয়াবহতায় আচ্ছন্ন। সে সময় এক বিদেশী তরুণী শিল্পীর তুলিতে ঢাকা হয়ে উঠল ভালোবাসা ও স্বপ্ন নগরীরূপে।

ঢাকা অতীতের মত বর্তমানে নানা রকম নাগরিক সমস্যার শিকার। উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্রিকায় এ বিষয়ে অনেকবার লেখালেখি হয়েছে। ৫ ডিসেম্বর ১৮৮০ সালে ঢাকার নাগরিক সমস্যা নিয়ে "ঢাকা প্রকাশে" মন্তব্য করা হয়েছিল "ঢাকার গলিতে যাহারা বাস করে। তাহারাই বাস্তব ঢাকা নিবাসী। তাহারাই নিয়মিতরূপে টেক্স প্রদান করে। অথচ কি অবিচার ও আশ্চর্য যে সে সকল স্থানের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ। যাহারা উপনিবেশী। কেবল কার্যগতা কিছুকালের জন্য বাস করিতেছে। এমনকি টেক্স ও প্রদান করে না। তাহাদের জন্যই মিউনিসিপ্যাল কমিটি ব্যস্ত।[১০]

নাগরিক সমস্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বংসলীলা এবং ইতিহাসের উত্থান পতনের মধ্যেও ঢাকার মানুষ যুগে যুগে অফুরন্ত জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছে। ঢাকা শিল্প প্রধান এবং উৎসব নগরী। ঈদ, মহররম ও জন্মাষ্টমী এই তিনটি উৎসবের সময় ঢাকা শহর নতুন রূপ ধারণ করতো।

তিনটি উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল মিছিল। সে ঝলমলে উল্লাসমুখর মিছিল আজ স্মৃতি। এসব মিছিল দেখতে লোক ভিড় জমাতো ঢাকায়। ঈদের মিছিলে আনন্দ উল্লাসের অজস্র উপকরণ যেমন থাকত, তেমনি অনিবার্য বলে বিবেচিত হত। শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের দিকটাও এ মিছিলে অবহেলিত হয়নি। ঢাকার এসব মিছিলে উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে সম্প্রীতি সৃষ্টি হত।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস উপলক্ষে ভাদ্রমাসে ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্মাষ্টমীর মিছিল বের হত। জন্মাষ্টমীর মিছিল এত বিখ্যাত হয়েছিল যে পুরো ভূ-ভারতে এর জোড়া ছিলনা। সোনা ও রূপার চৌকি অর্থাৎ সিংহাসন মূর্তি এক পাল হাতি

www.pathagar.com

এ মিছিলের শোভাবর্ধন করত। ঢাকার পিলখানার হাতি সুন্দর সাজে সাজিয়ে প্রধান প্রধান রাজপথের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। ব্রাডলি বার্ট লিখেছেন, অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য এই শান্ত ঘুমন্ত নগরীর রূপান্তর ঘটে। এই উৎসব উপলক্ষে বহু দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে লোক এসে প্রধান রাস্তাগুলোতে সমবেত হয়।[১১] মোগল রাজকীয় শোভাযাত্রার অনুকরণে জন্মাষ্টমীর মিছিল সাজানো হত। দীর্ঘদিন বিরতির পর মিছিলটি কয়েক বছর থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে।

পূর্ববঙ্গে ঢাকা ছিল মহররম পালনের প্রধান কেন্দ্র। মহররম অনুষ্ঠানের প্রধান অংশ ছিল শোকের মিছিল। এ উপলক্ষে মেলাও হত। মহররম মিছিলের অগ্রভাগে থাকত কয়েকটি আখাড়া। এরপর পতাকাবাহী বা আলম বরদার। নিশান নিয়ে সজ্জিত হাতি। হাতির পরে ঘোড়া। ঘোড়ার পাশেই থাকত লাঠিয়াল বা আশা বরদার, তারপর নোহা গায়কের দল। এরপর ঘোড়ার পিঠে নহবত পিছনে বাদকদল। একটি ডংকা সবশেষে ডংকার পিছনে জোড়া জোড়া 'বিবি কা ডোলা'। কালো কাপড়ে মোড়া পালকি শ্লোগানরত ভিস্তির দল। ফাঁকে ফাঁকে শোনা যায় ভেস্তাদের এক নারা দোনারা বোলো বোলো ভে-স্তা। পূর্বে 'বিবি কা ডোলা' উটের পিঠে বহন করা হতো। ডোলার পরে জুলজানা বা সজ্জিত ঘোড়া এরপর দুলদুলকে (খুনীঘোড়া) নিয়ে শোকাহত মিছিল এগিয়ে যেত। বিভিন্ন রংয়ের সিল্কের নিশান মিছিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। সর্বশেষে হাতির পিঠে দু'জন ঢোল বাদক ধীরগতিতে ঢোল বাজিয়ে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করত। এসব ছাড়া মিছিলে আরও অনেক রকম জিনিস বহন করা হত। মহররম মিছিল এখনও হয় অবশ্য জৌলুস আগের মত নেই। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাগরণের প্রতীক হয়ে উঠেছিল ঈদের মিছিল।

মোগল নায়েব নাজিম, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ঢাকায় জাঁকজমক সহকারে ঈদের মিছিল বের হত। এ মিছিলে শাসকসহ দেশী-বিদেশী লোকজনও অংশগ্রহণ করত।

ঢাকার ইতিহাসগ্রন্থ বারবার পাঠ করে আমি বিস্মিত হয়েছি এই ভেবে যে ঢাকার অনবদ্য কৃষ্টি ঈদ মিছিলের বাস্তব ঘটনা ও প্রকৃত ইতিহাস আজ বিস্মৃতির অতলগর্ভে হারিয়ে যেতে বসেছে।

হেনরি গ্লাসি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি লোক সংস্কৃতির অধ্যাপক। তিনি বাংলা একাডেমীর আমন্ত্রণে ১৯৯৫ সালে এদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্প নিয়ে গবেষণা করার জন্য বাংলাদেশে আসেন। তিনি সে বছর ঈদের মিছিল দেখেছিলেন। ঈদ মিছিল দেখে তিনি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন সে লেখা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি,

এই আদি অকৃত্রিম, দিলখোলা, মজার ঈদ প্যারেডে যে ভালো দিকটি উদযাপিত হয় সেটি এই জাতির বীরত্বগাঁথা, এর অর্জন। আর এতে যে খারাপ দিকটির সমালোচনা করা হয় সেটি হলো যাদের কাছে ওই অর্জনের জিম্মাদারি

www.pathagar.com

ছিল সেই সরকার ও জনগণের ব্যর্থতা পুরনো ঢাকার মানুষ জনের সাহস এবং উইটকে বুঝতে চাইলে একবার কল্পনা করুন ৪ জুলাইয়ে (যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস) তাদের এই প্যারেড ওয়াশিংটন ডিসির রাস্তায় আলোড়ণ তুলে যাচ্ছে, কিছু কিছু মঞ্চশকটে চরম মুনাফাখোর চাটুকার, ঔষুধ কোম্পানির লোকজনকে দেখা যাবে। থাকবে ছিনতাইকারী, মাতাল, এবং নেশাখোররাও। এদের অন্তর্ভুক্তির কোনো ব্যাখা দরকার নেই। কিন্তু অন্যগুলোর বেলায় হয়তো ব্যাখ্যা লাগবে। যেমন এই প্যারেডে একটি মঞ্চশকটে অবশ্যই থাকবে ক্রীতদাস নিলামের বিষয়টি একটিতে দেখা যাবে প্রেসিডেন্ট শটস পরে জগিং করছেন। ইন্সুরেন্স কোম্পানির লোক এক কংগ্রেস ম্যানকে ডলারের বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে তার স্বার্থ হাসিলের জন্য। কথা হলো, ঢাকার লোকের কাছে ইতিহাসের একটি নিজস্ব চিত্র আছে। এরা এদের সমস্যাগুলো বোঝে। তারা বোঝে, অভিযোগ করে এবং এগুলো উৎরে যাওয়ার জন্য কঠিন সংগ্রাম করে।[১২]"

অতীতের গহবর থেকে যে কিছু উদ্ধার করা যাবে, তাও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ যে সব সূত্র ও চিহ্ন ধরে তা করা হবে তাও বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

ঢাকার ঈদের মিছিল হল চলমান শিল্প প্রদর্শনী। ঢাকাবাসী তাদের শিল্প নৈপুণ্যের চরম নিদর্শন প্রদর্শন করতেন মিছিলে। চলমান শিল্প প্রদর্শনীরূপে ঈদের মিছিল হল আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান।

ঢাকার মহররম ও জন্মাষ্টমীর মিছিল নিয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংরক্ষিত আছে। ঈদের মিছিল নিয়ে তেমন লেখালেখি হয়নি তথ্যের অভাব রয়েছে। গবেষণা এ গ্রন্থ রচনার জন্য ১৯৯৫ পূর্বে থেকেই তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করি। ৫ জুন ১৯৯৭ সালে ঈদুল ফিতরের পূর্বে "দৈনিক দিনকাল" পত্রিকায় আমার "ঢাকার ঈদ আনন্দ মিছিল" শিরোনামে একটি তথ্য বহুল নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। শুধু ঈদ মিছিলকে কেন্দ্র করে এত দীর্ঘ আকৃতির লেখা ইতিপূর্বে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। এরপর "দৈনিক মুক্তকণ্ঠে" ১৬ জানুয়ারি '৯৯ তারিখে "আদি ঢাকার ঈদ উৎসব" ও নতুন তথ্য নিয়ে ৮ জানুয়ারি ২০০০ তারিখে "ঢাকার ঐতিহাসিক ঈদের মিছিল" এবং "ঢাকা সমিতি স্মারক গ্রন্থে' উক্ত লেখাটি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী "শিশু" পত্রিকায় নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৯ ঈদ সংখ্যায় ছোটদের উপযোগী করে "ঢাকায় ঈদের মিছিল" লেখা প্রকাশিত হয়। এর পরবর্তিতে ২৪ নভেম্বর ২০০২ দৈনিক যুগান্তর ও ২১ নভেম্বর ২০০৩ দৈনিক ইনকিলাবে লেখাটি ছাপা হয়।

ঢাকার মহররম মিছিল নিয়ে দৈনিক মুক্তকণ্ঠে ২১ এপ্রিল ১৯৯৯ ও দৈনিক যুগান্তরে ১লা মার্চ ২০০৪ সালে লেখাটি প্রকাশিত হয়। ঢাকার মহররম ও জন্মাষ্টমী মিছিলের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আমার প্রকাশিতব্য "ঢাকার সাংস্কৃতি" বিষয়ক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঈদের মিছিল নিয়ে এ পর্যন্ত কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। যতটুকু তথ্য বিভিন্ন লেখকের স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া গেছে তা

www.pathagar.com

থেকে গ্রহণ করেছি। চল্লিশ, পঞ্চাশ দশকে যারা ঈদের মিছিলের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং মিছিলে অংশ নিয়েছেন তাদের বংশধরদের অধিকাংশের কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি পাওয়া যায়নি। চতুর্থ অধ্যায়ে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত আমার স্বচক্ষে দেখা ঈদ মিছিলের বর্ণনা তুলে ধরেছি।

নায়েব নাজিম আমলের ঈদ মিছিলের প্রতিচিত্র জাতীয় জাদুঘর থেকে সৌজন্য স্বরুপ পেয়েছি। ছবির ক্যাপশন ঢাকা নগর জাদুঘর থেকে সংগ্রহ করেছি।

গ্রন্থটি রচনা করার সময় আমি ব্যক্তিগত লাইব্রেরীসহ উপাত্ত সংগ্রহের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী, শিশু একাডেমী লাইব্রেরী, জাতীয় আর্কাইভস, প্রেস ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ভারতীয় দূতাবাস, লাইব্রেরী ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর লাইব্রেরীতে রক্ষিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িকী থেকে উপকৃত হয়েছি। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে জানাই ধন্যবাদ।

গ্রন্থটি রচনার সময় আমাকে উৎসাহিত করেছেন পীরজাদা সাঈদ আনওয়ার মোবারকী, বাল্য বন্ধু মোঃ আফতাব ও জাকির হোসেন। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নাসিমা ইসলাম স্বপ্না সময়ে সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে কাজ করার উদ্যমকে অব্যাহত রেখেছেন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর লাইব্রেরীয়ান ও সু- লেখিকা রেজিনা আখতার, এবং কবি ও সাংবাদিক ফারুক নওয়াজ গ্রন্থ প্রকাশের কাজটি সুগম করে দিয়েছেন।

রিদম প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী মোঃ গফুর হোসেন সানন্দে গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রুফ দেখার কাজে সহায়তা করেছেন দৈনিক দিনকালের সাংবাদিক সুমন মাহবুব। উপরে উল্লেখিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকার ঈদ মিছিলের অতীত ও বর্তমান নিয়ে এই প্রথম একটি গ্রন্থ রচিত হল। যদি অত্রগ্রন্থে মুদ্রণ ত্রুটিসহ অসাবধান বসত তথ্যগত ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে পাঠককে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি। এ থেকে পাঠক ও গবেষকগণ সামান্যতম উপকৃত হলে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। ঢাকা শহর এখনও ঢেকে (আবৃত্ত) আছে এর প্রতি তীব্র আলো নিক্ষেপ করে এর সৌন্দর্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। ভবিষ্যতে ঢাকা বিষয়ে আরো কাজ করার ইচ্ছা রইল।

২৪/এ নবাব কাটারা, নিমতলী,
ঢাকা-১০০০

রফিকুল ইসলাম রফিক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ঈদ

ঈদ শব্দের সাধারণ অর্থ আনন্দ উৎসব। রোজার একমাস কঠিন সংযম শেষে ঈদ হচ্ছে উৎসবের দিন। ঈদ শব্দের আভিধানিক অর্থ বারবার ফিরে আসা। এটি একটি আরবী শব্দ। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ঊষালগ্নে থেকেই ঈদ উৎসব অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপিত হচ্ছে। এই আনন্দের দিনটি প্রতিবছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে এর নামকরণ হয়েছে ঈদ। ইসলাম ধর্মে যে কয়েকটি আনন্দ উৎসব রয়েছে তার মধ্যে ঈদ উৎসব সর্বশ্রেষ্ঠ।

নির্মল খুশির দিনটিতে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে আন্তরিক ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার মূল্যবোধকে। একে অন্যকে কাছে টেনে নেয়ার দিন ঈদ। ঈদ দেয় অহংকার আভিজাত্য ভুলে গিয়ে সকলের জন্য নিজেকে নিবেদন করার মহান দীক্ষা। এ আনন্দ নির্মল পবিত্র এবং আত্মশুদ্ধির আনন্দ।

পৃথিবীর সব মুসলমান প্রধান দেশেই ঈদ শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়। একটি আনন্দ উৎসব ও যার সঙ্গে সেই দেশের সংস্কৃতির একটি নিবিড় বন্ধন রয়েছে।

ঢাকা কত ঘটনার জন্য যে বিখ্যাত হয়ে আছে তা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা কঠিন। ঈদের আনন্দ উৎসব করার জন্য এ শহরের খ্যাতি রয়েছে।

রোজা ও ঈদ উৎসবের প্রচলন এদেশে মুসলিম অধিকারের পূর্বেই হয়েছিল। দেশ বিজয় করে মুসলিম শাসক এদেশে প্রবেশের বহু পূর্বেই সূফী সাধক ও আরব বণিকদের দ্বারা এদেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রচলন হয়েছে। সে কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।

সুবেদার ইসলাম খাঁ চিশতী রাজধানী স্থাপনের পূর্বেই ঢাকা অঞ্চলে মুসলমান ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, সংস্কৃতি সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তবে সুলতানী ও মোগল আমলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার ফলে উৎকর্ষতা লাভ করে।

www.pathagar.com

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সুবেদার ইসলাম খাঁ চিশতীর সঙ্গে তার নৌবাহিনী প্রধান 'বাহারস্থান ই-গায়বী' গ্রন্থের লেখক মীর্জা নাথান ঢাকা আগমন করেছিলেন, তিনি তাঁর গ্রন্থে মোগল অভিযানের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

রোজা সম্পর্কে তার বিবরণঃ সপ্তদশ শতকের গোড়াতে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আরবী শাবান মাসের ২২ তারিখ থেকেই রোজার আয়োজন শুরু হত। এ সময় থেকে মসজিদ সংস্কার ও আবাসিক গৃহাদি পরিচ্ছন্ন করার কাজ চলত। বাড়ির কর্ত্রী পানি ঠাণ্ডা রাখার জন্য নতুন সুরি ক্রয় করতেন। ইফতারের সময় এ ঠাণ্ডা পানি পান করা হত।

ইফতার সামগ্রী তৈরি করার জন্য গোলাপজল, কেওড়া ও তোকমা ব্যবহার করতো। সারা রোজার মাস ব্যবহার করার জন্য প্রচুর পরিমাণ পান ও পান মসল্লাও মজুদ করা হত।[১৩] এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় সে আমলে ঢাকার রমজান মাসের কর্মসূচিতে তারা কতটা সচেষ্ট ছিলেন।

মীর্জা নাথানের বর্ণনায় মোগলদের রোজা ও ঈদ উদযাপনের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, রমজান মাসের সূচনা থেকে এর শেষ দিন পর্যন্ত ছোট বড় সকলে প্রত্যহ নিজ নিজ বন্ধুর তাঁবুতে যেতেন। এটা একটা সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়ায় যে প্রত্যহ সকালে এক একজন বন্ধুর তাঁবুতে তাদের সময় কাটাতো। সেই অনুসারে শেষের দিন রাত্রে মুবারিজ খানের সন্ধ্যা ভোজ ছিল। সমস্ত লোক সেদিন তার সেখানে সময় কাটায়।[১৪]

সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বলা চলে যে, মোগল ও প্রাক-মোগল আমলে ঢাকার মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলিম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেতে শুরু করে।

ইফতার

ঢাকা পবিত্র রমজান মাসে খাওয়া-দাওয়ার প্রাচুর্যে এক নতুন রূপ ধারণ করে। বিত্তবানদের কথা বাদই দিলাম। গরীবদের ঘরেও সাধ্যতীত খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হত। ইফতার তৈরি করে নিজেরা খেতেন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে পাঠাতেন। পরিবারের কোন সন্তান প্রথম রোজা রাখলে তাকে ইফতার সামগ্রী সহকারে মসজিদে পাঠানো হত। এক সময় ঢাকা শহরে মসজিদে মসজিদে মুসল্লীদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ ছিল আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

ইফতারির জন্য নিজের ঘরের বহুবিধ তৈরি খাবার থাকা সত্ত্বেও অনেকেই চকবাজার ইফতার মেলায় যেতেন। মোগল আমল থেকে এ পর্যন্ত চকবাজার

www.pathagar.com

সবসময় সরগরম। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব ছাড়াও রমজান এবং ঈদ উপলক্ষে চকবাজার হয়ে উঠত কোলাহল আর উৎসবমুখর।

প্রাচীনকাল থেকেই চকমসজিদের পাশের রাস্তাটিতে চমৎকার ইফতারের বাজার বসে থাকে। নানা ধরনের ইফতারের আয়োজন আর সুগন্ধে মেতে ওঠে গোটা চকবাজার, নানাধরনের ফলমূল ছাড়াও এখানে পাওয়া যেত ঢাকাই শিরমাল, নানখাতাই, কাকচা, কুলিচা, চাপাতি আর নানা ধরনের মজাদার বাকরখানি। এছাড়া ঘুগনী পিঁয়াজি, বেগুনি, লাচ্ছা, তেহারি, নিমকি, সামুসা, জিলাপি, দইবড়া আরও অনেক ধরনের ইফতার বর্তমানে ফাস্টফুডও পাওয়া যায়।

ঘোল বা মাঠার শরবত, ফালুদার শরবত, তোকমার শরবত, বেলের শরবত, লেবুর শরবত, তেঁতুল ও গুড়মিশ্রিত টকমিষ্টি শরবত, ইসফগুল, বেদানার শরবত। বিহিদানার শরবত ও বিভিন্ন রকমের ফলের শরবত জাফরানি শরবতের প্রচলন অতীতের মত এখনও আছে। তাছাড়া হাণ্ডিকাবাব, শামীকাবাব, শিককাবাব, মাছ ও গোশতের কাবাব লম্বা লোহার শিকে গেঁথে তৈরি করা হয় সুতলী কাবাব। এসব ছাড়াও আস্ত মুরগির রোস্ট। বিভিন্ন ধরনের হালুয়া।

বড় বাপের পোলায় খায় ঠোঙায় ভইরা লইয়া যায়। এই অনবদ্য আইটেমটি স্বাদে যেমন মজার তেমনি নামটির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে। বারো মসলা মেশানো বড় বাপের পোলায় খায়, ১ কেজির দাম ১৯০ টাকা। চিঁড়া ভাজা, মুরগির রোস্ট, খাসির মগজ, কলিজা, সুতলী কাবাব, বুটের ডাল, ঘুমনি, ডিমসিদ্ধ, খাঁটি ঘি, গোলমরিচ, গরম মসলা, জিরাগুঁড়া, কাঁচা মরিচ, আর লেবু মিশিয়ে তৈরি করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই চকবাজারে বিক্রি হচ্ছে এই ইফতারি।

ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের অন্যকোন স্থানে এরকম বিরাট ইফতার মেলা বসে বলে জানা যায় না। চকবাজারের ইফতার মেলা হল ঢাকার মানুষের মিলনমেলা। একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

চকবাজারে যেমন ইফতারির বিশাল মেলা হয়ে থাকে, বেইলি রোডেও বিগত কয়েক বছর থেকেই চলে ইফতারের রাজসিক আয়োজন। বেইলি রোডের সবচেয়ে অভিজাত ফাস্ট ফুড দোকান ঢাকাইয়া মালিকানায় ক্যাপিটাল কনফেকশনারীতে ক্রেতার ভিড়ে ঢুকাই যায় না। ১৭০টির অধিক আইটেমের ইফতারি শুধু এই দোকানেই তৈরি করা হয়।

ঢাকার রোজা সম্পর্কে অধ্যাপক কাজী দীন মুহাম্মদ নিম্নলিখিত স্মৃতিচারণ করেছেন-সারা রমজানেই ঈদের প্রস্তুতি চলত। কিন্তু ঈদের আগেও ঢাকাবাসী

www.pathagar.com

ত্রিশ দিনে ত্রিশটি ঈদ উদযাপন করত। অর্থাৎ তারা যে ইফতারির ব্যবস্থা করত তা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। হেকিম হাবিবুর রহমান সাহেবের বাড়িতে একবার আমাদের কিছু লোকের দাওয়াত ছিল। ইফতারি তো নয়, সে এক শাহানশাহী ব্যাপার। পানি ও নিমক পাড়া ছাড়া, ঐ পার্টিতে তেইশ পদের ইফতারির ব্যবস্থা ছিল।[১৫]

উচ্চবিত্ত ছাড়াও ঢাকার মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারে অনেক রকমের ইফতারির ব্যবস্থা করা হত।

কাশিদা

আরবী ভাষায় কোন পরিজনের প্রশংসামূলক কবিতাকে কাশিদা বলা হয়। রজমান মাসে তরুণরা মহল্লায় মহল্লায় পথচারিতা করে হামদ, নাত ও উর্দু কাশিদা গেয়ে রোজাদারকে জাগাতেন। প্রত্যেক মহল্লার পঞ্চায়েতে কাশিদার দল থাকত। ঢাকায় পাঠান ও মোগল আমলে কাশিদা গেয়ে সেহেরী খাওয়ার জন্য ডেকে ওঠানোর প্রচলন ছিল। খাজা আহসানউল্লাহর সময় তা আরও উৎকর্ষতা লাভ করে। আজও ঢাকা শহরে কাশিদা গাওয়ার প্রচলন রয়েছে। রমজান মাস এলেই বিভিন্ন সংগঠন ও মহল্লাবাসী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকেন। বছরের অন্যান্য সময়েও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাশিদা পরিবেশন করা হয়।

ঈদের চাঁদ

রমজান মাসের দীর্ঘ একটি মাস, রোজার পর সওয়াল মাসের নতুন চাঁদ ঈদের আগমন বার্তা নিয়ে হাজির হয়। ঈদের চাঁদ সতেরো শতকেও আনন্দ উৎসবের বার্তা নিয়ে আসত। তখনকার দিনে ঈদের চাঁদ দেখাটাও ছিল খুব আড়ম্বরপূর্ণ। অনেক প্রতীক্ষিত এ দিনটিতে চাঁদ দর্শনের জন্য মানুষ মাঠে ময়দানে অথবা অনেকে বাড়ির ছাদে সমবেত হতো। সেকালে আহসান মঞ্জিল, বড় কাটারা, হোসেনী দালানে বিকেল থেকেই ঈদের চাঁদ দেখার জন্য মানুষ ভিড় জমাত। উন্মুক্ত দিগন্তে চাঁদ দেখার জন্য কেউ কেউ বুড়িগঙ্গায় নৌকায় সওয়ার হতেন। চাঁদ দেখে একজন আরেক জনকে সালাম জানাত।

চাঁদ দেখার পর মুরব্বিরা মোনাজাত পড়তেন। আর দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা যেত মুরব্বিদের কদমবুছি করার জন্য। মোবারক বাদ ও দোয়া বিনিময় চলত মুরব্বিদের মধ্যে। উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকার নবাববাড়ি থেকে তোপধ্বনি করে চাঁদ ওঠার সংবাদ জানিয়ে দেয়া হত। চাঁদ উঠার আনন্দ প্রকাশ করার জন্য ছোট ছেলে-মেয়েরা আতশবাজি জ্বালিয়ে ও

www.pathagar.com

পটকা ফুটিয়ে আনন্দ উল্লাস করত। আতশবাজি ছিল অনেক রকমের তারাবাতি, মরিচ। ফোয়ারা, মাহতাবি, মাররা, হাওয়াই, পটকা, চরকি, কবুতরি, টোল্টা, দো-দাম্বা, ব্যাণ্ডবাজি ইত্যাদি।

আজও ঢাকা শহরে চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে সোরগোল আরম্ভ হয়। বিভিন্ন ধরনের বাজি ফুটিয়ে যুব সমাজ আনন্দ প্রকাশ করে। সাইরেন বেজে উঠে। রাস্তায় চলমান গাড়িগুলো হর্ন বাজিয়ে আনন্দ উল্লাস করে। অনেকে আনন্দ উল্লাস করতে করতে রাস্তায় নেমে আসে।

মুসলিম সমাজে আনন্দের প্রবাহ সৃষ্টি করতে ঈদুল ফিতর ধর্মীয় অনুভূতির অলংকারে সজ্জিত হয়ে আসে। মানুষে মানুষে কলহ করে যে বিভেদের দেয়াল সৃষ্টি করে রাখে ঈদের উৎসব এসব বাধা চূর্ণ করে মানুষের জীবনের অন্তর্লীন ঐক্যের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে।

ঈদুল ফিতরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর সংযত প্রকৃতি। আত্মশুদ্ধির পথ ধরে আসে। একমাস সিয়াম সাধনার পরে ঈদের চাঁদ দেখার মধ্যে আছে সামাজিক উৎসবের এক অপার আনন্দ। ছিন্নমূল মানুষ থেকে শুরু করে বিত্তবান শ্রেণী পর্যন্ত সবাই সমান হকদার এই আনন্দে। ঈদুল ফিতরের আনন্দ উৎসব প্রতিবছরই আমাদের ঐতিহ্য চেতনার গভীরে আমাদের হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করে। এই পবিত্র ঈদের আনন্দে অবগাহন করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখলেন–

ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়েদে শোন আসমানী তাগিদ।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এই গানের শব্দমালার উৎস এবং এর সুর ও বাণী নিবেদিত সার্বজনীন মানব কল্যাণ ও সংহতি প্রতিষ্ঠার উদাত্ত আহবান। তিরিশ দশকে লেখা এই গান বাঙালি মুসলমানকে যুগ যুগ ধরে সুরে ছন্দে নাচিয়েছে। চিরকাল এই গান মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করবে তা আমাদের বিশ্বাস।

চাঁদ দেখে ঈদ করার আনন্দই আলাদা। অনেকেই ইচ্ছাপোষণ করেন ঈদের মিহি বাঁকা চাঁদের দর্শন লাভের। এমনকি বয়স্ক লোকজনও ঈদের চাঁদ দেখে আনন্দ মেতে উঠেন। ঈদের চাঁদ, ঈদের পূর্বের রাত, ঈদ সকাল, ঈদগাহ, ঈদের পোশাক, ঈদের কোলাকুলি, ঈদের খাবার-দাবার, সবকিছু নিয়ে ঢাকার আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

মোগল আমলে চাঁদ দেখে কিভাবে আনন্দ উৎসব করা হত মীর্জা নাথান তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, সে দিন দিনের শেষে সন্ধ্যায় নতুন চাঁদ (ঈদের চাঁদ) দেখা যায়। শাহী তুর্য বেজে ওঠে এবং একের পর এক গোলন্দাজ বাহিনী থেকে আতশবাজি শুরু হয়। সন্ধ্যার প্রথম থেকে মধ্যরাত্রি অবধি গোলন্দাজ

www.pathagar.com

বাহিনী একটানা বন্দুকের গোলাগুলি ছুঁড়তে থাকে। রাত শেষের দিকে বন্দুক ছুঁড়া বন্ধ হয় এবং বড় কামান থেকে গোলা নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। তাতে ভূমিকম্পের অবস্থা সৃষ্টি হয়।[১৬] বাংলাদেশে মোগল সেনানিবাস থেকে কিভাবে ঈদের আনন্দবার্তা ঘোষণা করা হতো তা এতে উপলব্ধি করা যায়। জানা যায় মুসলমানেরা কিভাবে ঈদ উৎসবকে স্বাগত জানাত।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর এবং মোগল রাজধানী। মোগল ঢাকার ঈদের উৎসব অতি জাঁকজমকের সাথে পালন করা হতো।

নবাব আহসানউল্লাহর ডায়েরী থেকে জানা যায়, উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঢাকার আহসান মঞ্জিলের নবাবগণও জাঁকজমক সহকারে ঈদ উদযাপন করতেন। নবাব আহসানউল্লাহ চন্দ্র মাসে চাঁদ দেখার জন্য মাসের প্রথম তারিখ থেকে উদগ্রীব থাকতেন। বুড়িগঙ্গায় তার ফ্লাটে গিয়ে ভালভাবে চাঁদ দেখতেন। ইসলামী বিধান মতে ঈদ উদযাপন করতেন। জাঁকজমক সহকারে ঈদ আনন্দ উৎসব করতেন। এবং আত্মীয়-স্বজনকে ঈদের সালামী বণ্টন করতেন। ইউরোপীয় সাহেব মেমরাও ভোজসভায় আমন্ত্রিত হতেন।[১৭]

"১৮ নভেম্বর ১৯০৬ সালের লেখা খাজা শামসুল হকের ডায়েরী থেকে অনুপম হায়াত জানান, নওয়াব সলিমুল্লাহ আজ সব মহল্লাবাসীকে আদেশ দেন, ওল্ড লাইনের দিলকুশা মসজিদে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়ার জন্য। খাজা শামসুল হক লিখেছেন, প্রায় পাঁচ হাজার লোক ঈদের জামায়াতে অংশ নেয়। নামাজ শেষে নওয়াব সলিমুল্লাহ আহসান মঞ্জিলে এক বিরাট ভোজ দেন। শহরের অনেক মুসলমান এতে যোগ দেয়।[১৮]

ধানমন্ডি ঈদগাহ।

www.pathagar.com

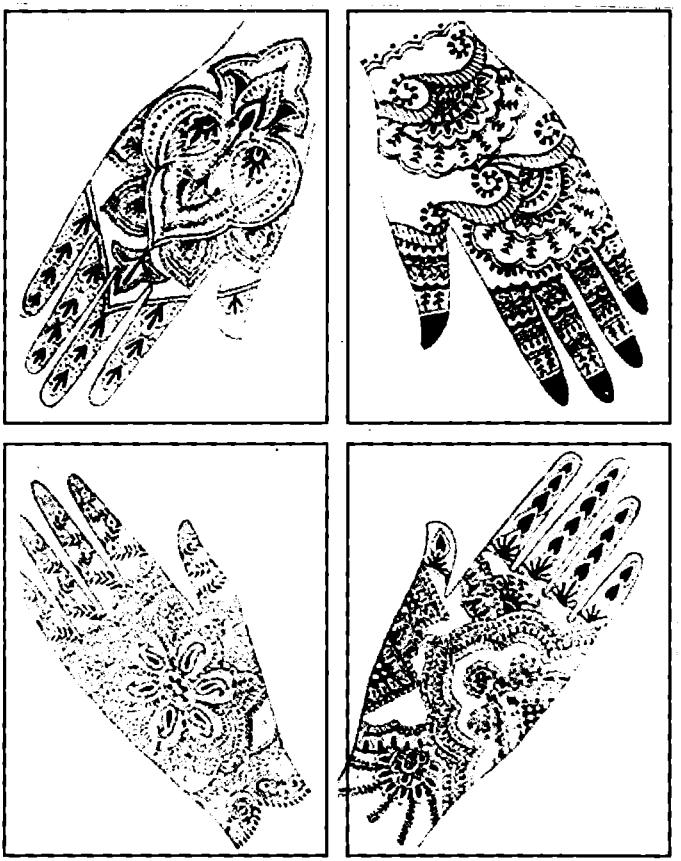

মেহেদী নক্শা।

মেহেদী

২৭ রমজান থেকে পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় মেহেদী রাঙানোর কাজ আরম্ভ হয়। হাতে মেহেদী লাগানোর ধুম পড়ে যায়। অনেক বান্ধবীরা মিলেমিশেও হাতে মেহেদী দিয়ে থাকে। কেউবা বিউটি পার্লারে চলে যায়। আজকাল প্লাষ্টিকের টিউব-এ মেহেদীর প্রচলন হয়েছে। হাতে বাটা মেহেদীতে লাল রঙের ঘনত্ব একটু বেশি। এস, ভাইস কোম্পানি বনানীর ইউ,এ, ই মার্কেটে ২০০০ সালে তিন দিনব্যাপী মেহেদী উৎসবের আয়োজন করে। মোগল স্থাপত্যের ধরন থেকে মেহেদী নকশার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী মোগল ফ্যাশন অনুযায়ী আসন ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাজারীবাগের ঢাকাবাসী সংগঠন ঈদুল ফিতর, ও ঈদুল আযহার সময়ও মেহেদী উৎসবের আয়োজন করে থাকে।

www.pathagar.com

ঈদের নামাজ

ঈদের দিনে সকালে কেউ মসজিদে আবার কেউ ধানমন্ডির ঈদগাহে নামাজ পড়তে যেতেন। অনেকে অতি আনন্দের সাথে চকবাজার ও লালবাগ শাহী মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন। অন্যান্য মসজিদেও বিশেষভাবে ঈদের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করা হত। সাধারণত ঈদের নামাজ ঢাকা শহরে খোলা ময়দানে বিরাট জামায়াতে আদায় করা হত। ধানমন্ডির ঈদগাহে মোগল নবাবদের শাপাশি ঢাকার অভিজাত লোকেরা নামাজ পড়তে যেতেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত জেমস টেলর গ্রন্থে বলা হয়েছে সেকালে মুসলমানদের উপাসনার প্রধান দুটি স্থান ছিল ঈদগাহ এবং হোসেনী দালান।[১৯] ধানমন্ডি ঈদগাহ মোগল আমলে নির্মিত ঢাকার প্রথম সরকারি ঈদগাহ।

ঢাকার শত শত মসজিদসহ বিভিন্ন এলাকার খেলার মাঠ ছাড়াও পল্টন ময়দানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হত। পাকিস্তান আমলে পল্টন ময়দানে মুফতি দীন মোহাম্মদ ঈদের নামাজে কয়েকবছর ইমামতি করেছেন।

পল্টন ময়দানে ঈদের জামাতে মুফতি দীন মোহাম্মদ খোতবা পড়ছেন। ছবি-১৯৫২ দৈনিক আজাদ।

www.pathagar.com

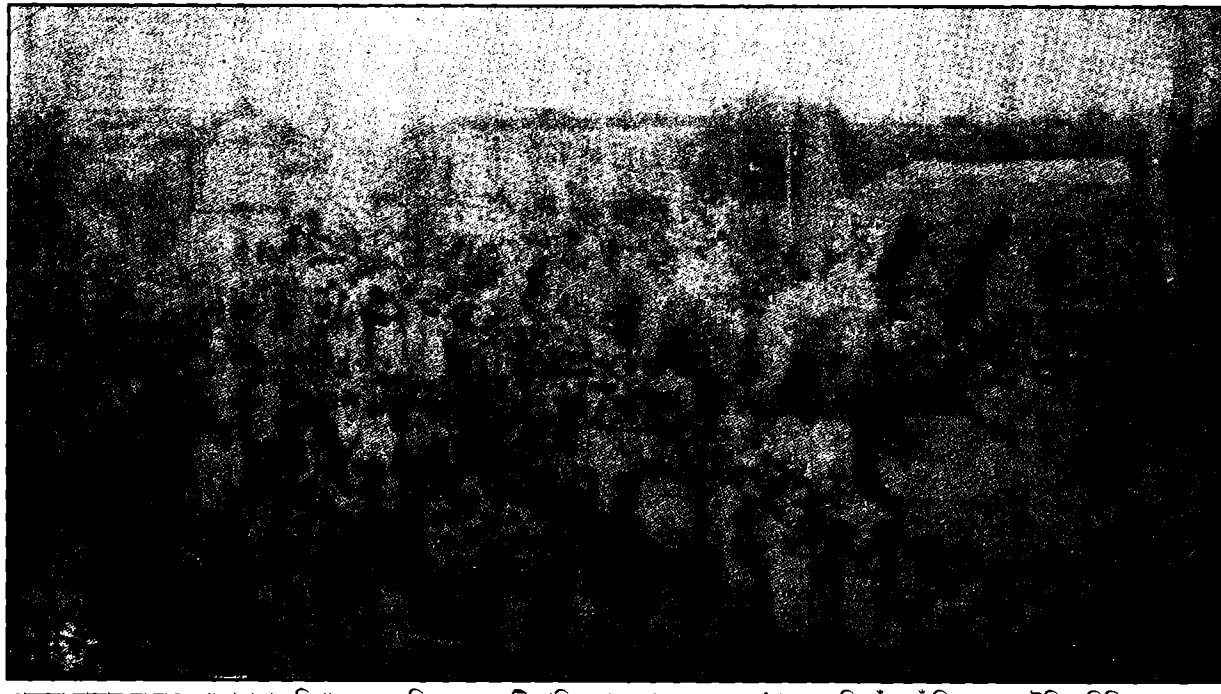

পুরনো ঢাকার রাস্তায় শোভাযাত্রা। নিশানসহ সুসজ্জিত কয়েকটি হাতি অগ্রসরমান। রাস্তার দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে টুপি পরিহিত লোকজন। ছবিটি খাজা আবদুল্লাহ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অবৈতনিক সম্পাদক, খাজা মোহাম্মদ হালিমের সৌজন্যেপ্রাপ্ত। হালিম সাহেবের ধারণা, এটি নবাব বাড়ি (আহসান মঞ্জিল) থেকে বের হওয়া ঈদের নামাজের শোভাযাত্রা।

www.pathagar.com

নামাজের মিছিল বা শোভাযাত্রা

মোগল আমলে শোভাযাত্রা করে ঈদগার মাঠে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। ঈদগার ময়দানে যাওয়ার পথে মুসল্লীরা তকবীর বা আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। দিল্লী শহরেও এভাবে নামাজ পড়ার প্রচলন ছিল। ঈদগাহে যাতায়াতের সময় তকবীর বলা সম্পর্কিত হাদিসে হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের ঈদসমূহকে তকবীর বলার সাহায্যে সুন্দর, আনন্দমুখর ও জাঁকজমকপূর্ণ করে তোল। ইমাম যুহুরী বলেছেন ঃ নবী করিম (সাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় থেকে নামাজের স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তকবীর বলতে থাকতেন।[২০]

মোগল আমলে ধনীরা সুন্দর দামি পোশাক পরে শোভাযাত্রা করে ঈদগাহে যেতেন এবং তারা ঈদগাহে যাওয়ার সময় রাস্তায় লোকজনকে উপহার এবং অর্থ বিতরণ করতেন। নওবাহার- ই- মুর্শিদকুলী খান গ্রন্থের লেখক আজাদ হোসেন বিলগ্রামী লিখেছেন যে নবাব সুজাউদ্দীনের অধীনস্ত ঢাকার নায়েব সুবেদার মুর্শিদকুলী খান ঈদের দিন ঢাকার দুর্গ থেকে ঈদের ময়দান পর্যন্ত একক্রোশ পথে প্রচুর পরিমাণ টাকাকড়ি ছড়িয়ে দিতেন। মুসলমানেরা ঈদগার বিরাট জামায়াতে ঈদের নামাজ পড়তেন ও আমোদ প্রমোদ চলতো এবং সর্বত্র অভিনন্দনের আনন্দে মুখরিত হতো। এই সমস্ত বড় উৎসবের দিনে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ও একত্রে আনন্দ-উৎসব করার জন্য তারা বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গমনাগমন করতেন।[২১]

মোগল নবাবদের ঐতিহ্যটি উনিশ শতকেও একেবারে বিলীন হয়নি। এ সময় ঢাকার আহসান মঞ্জিলের নবাবগণ ঈদ উৎসব, মহররম, হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর মতো উৎসবের সময়ও অর্থ ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করতেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ঢাকা শহরে শোভাযাত্রা বা মিছিল করে ঈদগাহের মাঠে যাওয়ার প্রচলন ছিল এ সম্পর্কে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের চমৎকার স্মৃতিচারণটি তুলে ধরছি। "আমার ছেলে বেলায় ঈদের উৎসবকে দেখেছি সম্মিলিত আনন্দের উৎসব হিসাবে। ঢাকার পুরানো পল্টনে ঈদের সবচেয়ে বড় জামাত হত। বিভিন্ন মহল্লা থেকে লোকেরা মিছিল (শোভাযাত্রা) করে আসত নামাজে অংশ গ্রহণের জন্য। এভাবে মিছিল করা নিয়ে প্রতিযোগিতা ছিল। সবারই চেষ্টা ছিল আপন আপন মিছিল অন্যান্য মিছিলের চাইতে বর্ণাঢ্য করা। এই বর্ণাঢ্য করার স্বরূপটা ধরা পড়তো মাথার

www.pathagar.com

টুপিতে এবং নিশান ওড়ানোর মধ্য দিয়ে। একবারের কথা মনে আছে। সেবার সবচেয়ে সুন্দর মিছিল এসেছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে। ডঃ হাসান মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন। এই ইতিহাস এখন হারিয়ে গেছে। তখন আনন্দের জন্য মিলিত সমাবেশ ছিল। মানুষে মানুষে মিলনের সুনিশ্চয়তা ছিল। ঈদের দিনে মানুষে মানুষে শ্রেণী ভেদ ধরা পড়তো না। মিছিল করে আসা সমবেতভাবে নামাজ পড়া এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করা ঈদের দিনের বিশেষ তাৎপর্য ছিল। মিছিল প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান আরও জানান ঈদের দিন সকালে এসব মিছিল দেখার জন্য রাস্তার ধারে হিন্দু-খ্রিষ্টানরা দাড়িয়ে থাকতো। ঢাকায় বিদেশী যারা ছিল তারাও এসব মিছিলের ফটো তুলবার জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতেন।[২২]

নতুন জামাকাপড় পরে ছোটরা বড়দের কদমবুছি বা সালাম করত। বড়রা তাদের দোয়া ও সালামী দিতেন। তখনকার দিনে সালামী হিসাবে চাদীর টাকা দেয়া হত। এখন টাকা দেয়ার প্রচলন হয়েছে।

নিরন্নকে সাহায্য করার মাধ্যমে ঈদের আনন্দ উৎসব করতে হবে। বিত্তবান ব্যক্তিরা ও ঈদের একটি দিন এতিমখানায় গিয়ে কাটাতে পারেন। কিছু খাবার তাদের জন্য নিয়ে গিয়ে নিজ হাতে পরিবেশন করতে পারেন অথবা একটি অসহায় পরিবারের হাতে তুলে দিতে পারেন কিছু অর্থ এটি তার কাজে লাগবে। আনন্দ পরিপূর্ণ হবে তখনই, যখন তা সবার জন্য আনন্দের হয়ে উঠবে।

ঈদের দিনের কোলাকুলি আজও অনেকটা আগের মতোই আছে। তবে পরস্পরের কোলাকুলির মধ্যে যে আনন্দ ও আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হত তা আজ আর আগের মত দেখা যায় না

এ শহরের গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্য আজকে হারিয়ে যাচ্ছে। ঢাকাবাসীদের বর্তমানে ঈদের বিনোদন বলতে যা বোঝায় তা হল টি.ভিতে দেশী-বিদেশী অনুষ্ঠান দেখা, সিনেমা দেখা, সংসদ ভবন, পার্ক ও চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়ানো বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া। পহেলা বৈশাখ, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারী, স্বাধীনতা দিবস, শবে বরাত, ঈদে মিলাদুন্নবী ইদানীং থার্টি ফার্স্টের রাতে ঢাকা শহর জাঁকজমক থাকলেও ঈদ পার্বণে মহানগরী উৎসবহীন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন একটি গাছ পাতা শূন্য হয়ে পড়ে তেমনি হয় অবস্থা।

www.pathagar.com

উনিশ শতকে চকবাজারে ঈদের মেলা।

ঈদের মেলা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোক সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হল মেলা। ছোট ছেলে-মেয়েরা মেলায় গিয়ে আনন্দে মেতে উঠত। আজও এ শহরে বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে মেলা হলেও ঈদের মেলা, তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলতে বসেছে। ধানমন্ডির ঈদগাহের পাশে ঈদ উপলক্ষে একটি মেলার আয়োজন করা হত। এখানে ঢাকা শহরের লোকজন ছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন মেলায় আসতেন। ঈদের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই এ মেলা শুরু হত। এ মেলা থেকে কেনা-কাটাও হতো অনেক। ঈদের দিন ছাড়া তার পরের কয়েকদিনও এ মেলা চলত।

উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকা শহরে ঈদ উৎসব ছিল আকর্ষণীয়। রমনার ময়দান, চকবাজার, ইসলামপুর , আরমানীটোলা, ধূপখোলা মাঠে এবং পল্টন ময়দানে ঈদের মেলা হত। নায়েব নাজিম আমলেও চকবাজারে ঈদের মেলা উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। জাতীয় জাদুঘরে এর জলরংয়ের চিত্র সংরক্ষিত আছে। মেলায় দেখা যায় হকাররা তাদের পণ্যদ্রব্য বা বিক্রয় করছে, অর্ধনগ্ন ফকির নৃত্য প্রদর্শন করেছে। ব্রিটিশের সৈন্য এবং শহরের নাগরিক এবং পাগড়ি পরিহিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকজন মেলায় এসেছেন।

www.pathagar.com

চকবাজারে এখনও ঈদের মেলা হয়, তবে তা আগের মত হয় না। বিলুপ্ত হতে চলেছে। অতীতে এসব জায়গায় মেলার অন্যতম আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য রূপে বিরাজ করতো নাগরদোলা, বাঁশের বাঁশী, টিনের বাঁশী, শিশুদের খেলনা, বিভিন্ন কুটির শিল্প বিভিন্ন পেশার লোকদের হাতের তৈরি খাবার উড়কি ধানের মুড়কি মিঠাইয়ের সঙ্গে রং বেরঙের খেলনা, পুতুল পিঁড়ি, প্রদীপ, এমনকি কাস্তে কোদাল-লাঙলের ফাল সবকিছুই মেলায় পাওয়া যেত। মাটির তৈরি বিভিন্ন ফলমূল, আম, কলা নারকেল, ছাড়াও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা শখ করে কিনতো মাটির রান্নার জিনিসপত্র পাটাপুঁতা, হাঁড়ি, পাতিল, কুলা, চুলা ইত্যাদি, নানা রকম খাবার খই, মুড়ি, মুড়কি, মাংসের বড়া, ছোট ছেলে-মেয়েরা ঘুরে ফিরে মনের আনন্দে খেত কুলফি বরফ রাঙ্গা শরবত আর হাওয়াই মিঠাই্, মেলায় ছোটদের কাছে একটি আকর্ষণীয় খেলনা ছিল ঢোলগাড়ি, গরুর গাড়ি মত দেখতে ছিল এ খেলনাটি চাকাওয়ালা এ গাড়িতে কোন গরু ছিলনা। সুতা বা দড়ি দিয়ে তা টেনে নিয়ে যাওয়া হত। এ খেলনায় গাড়িটার মাঝখানে মাটির মালসা আর তার ওপর পাতলা চামড়া লাগিয়ে বানানো হত ঢোল। চাকার সঙ্গে বাঁধা থাকত দুটি ঢোল। গাড়ি চলা আরম্ভ হলে দুটি কাঠি এক সঙ্গে ঘা মারত ওই ঢোলের ওপর। চমৎকার শব্দ করে বেজে চলত টম টম টম।

এ শতকের ঈদের বিবরণ দিতে গিয়ে আশরাফ-উজ-জামান জানান, রমনা এবং চকবাজারে ঈদের মেলা হত। নানা রকম ডালা আসত। সুন্দর করে সাজিয়ে ছানার খাবারের দোকান বসতো। নানা রকম কাঠের খেলনা দেখা যেত। মনমাতানো কাবলীর নাচ হত রেসকোর্সের ময়দানে। হাওয়াই বাজি আগুনের পাখা মেলে আকাশে উঠে নানা রংয়ের ছাতা মেলে আকাশে মিলিয়ে যেত।[২৩]

আজকাল হাজারীবাগ এলাকায় ঢাকাবাসী সংগঠন ঈদের মেলা বা লোকজ উৎসবের আয়োজন করে থাকে। শতাধিক ষ্টল বসে হাজারীবাগ পার্ক জুড়ে। মেলায় থাকে নাগরদোলা, লুপ্তপ্রায় কুটির শিল্প, মৃৎশিল্প আরও অনেক কিছু। ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উত্তর পাশে খলিল সরদার কমিউনিটি সেন্টারে দোতলায় বস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শতাধিক ডিজাইনের কাপড় এ প্রদর্শনীতে দেখা যায়। বিভিন্ন ডিজাইনের শাড়ী ও থ্রীপিস তার ষ্টলে প্রদর্শন করা হয়। মেলায় আরও দেখা যায় নানা ধরনের মিষ্টির দোকান। কাশিদা প্রতিযোগিতায় বংশী বাজারের জুম্মান আলী শ্রেষ্ঠ গায়কের পুরস্কার অর্জন করেন। জুম্মন আলী ষাট বছর ঢাকাবাসীকে রমজান মাসে

www.pathagar.com

সেহরীর সময় কাশিদা শুনিয়ে আসছেন। অতীতে ঢাকায় বর্তমানের মত বৈদ্যুতিক বাতি না থাকায় তারা হ্যাজাক লাইট ও হারিকেন জ্বালিয়ে কাশিদা গেয়েছেন।

পুরানো ঢাকার সুরিটোলা স্কুল প্রাঙ্গণে অত্র এলাকায় যুব সম্প্রদায় একটি চমৎকার ঈদ মীনা বাজারের আয়োজন করে থাকে। ৭০ নং ওয়ার্ড কমিশনার মীর সমীর গত দু'বছর এই মেলা উদ্বোধন করেছেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য সাদেক হোসেন খোকা এবং মেয়র হানিফ ঈদের পরদিন বিকালে এ মেলা পরিদর্শন করেন। এখানে প্রচুর লোক সমাগম হয়। স্টলগুলোতে ছোটদের খেলনা, হস্তশিল্প, তৈরি পোশাক, অডিও ক্যাসেট, স্ন্যাকস ও কনফেকশনারী, রেস্টুরেন্ট, জুয়েলারী ছাড়াও হকাররা বিভিন্ন ধরনের জিনিসের সমাবেশ ঘটিয়ে থাকেন। স্টল সুন্দরের জন্য পুরস্কার দেয়া হয়। অত্র এলাকার যুব সম্প্রদায় ঈদ মীনা বাজারের আয়োজন করে সেখানে একটি নতুন ঐতিহ্যের সূচনা করেছেন। এছাড়াও ঢাকার অনেক এলাকার রাস্তার পাশে বিভিন্ন সামগ্রী বসিয়ে মেলার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পহেলা বৈশাখে ধানমণ্ডি মাঠে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) একটি চমৎকার মেলার আয়োজন করে থাকে। তেমনি ঢাকায় ঈদ উৎসবে বিসিক কর্তৃপক্ষ পল্টন ময়দানে ঈদ মেলার আয়োজন করলে ঢাকার ঈদ মেলার ঐতিহ্য রক্ষা হবে এবং ঈদ উৎসবে ঢাকাবাসী একটি নতুন আনন্দের ক্ষেত্র খুঁজে পাবে।

অন্যান্য বিনোদন

ঢাকার ঈদ উৎসবের মজার আর্কষণ ছিল ঘুড়ি উড়ানো। সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে ঢাকার নবাবরা ঘুড়ি উড়ানোর আনন্দে মেতে উঠত। এছাড়া ধোলাইখাল ও বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকা বাইচের খেলা জমে উঠত। শীতের সময় ঈদ হলে আরমানীটোলা মাঠে সার্কাস, ঈদের পরের দিন শনিবার হলে রমনা রেসকোর্সে ঘোড়া দৌড়ের খেলায় মেতে উঠত ঢাকার মানুষ।

নবাববাড়ির রঙমহলে খুব জাঁকজমক সহকারে খানাপিনা চলত। মহল্লার ঘরে ঘরে নানা রকম খাবার এবং জাফরানি লাড্ডু বিতরণ করা হত। বাঈজি নাচের আসর জমত সন্ধ্যার পর দিলকুশায় নবাবদের বাগানবাড়ি ও আহসান মঞ্জিল আলো দিয়ে সাজানো হত। ঢাকার পঞ্চায়েতের সরদার এবং অভিজাত লোকেরা আহসান মঞ্জিলে আমন্ত্রিত হয়ে নবাবের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন। এ কালের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যেমন ঈদ উৎসবে সৌহার্দ্য বিনিময়ের

www.pathagar.com

জন্য রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। সেরকম সেকালে অভিজাত মুসলমান নাগরিকরাও যেতেন আহসান মঞ্জিলে নবাব বাহাদুরের কাছে। এ অনুষ্ঠানে ঢাকার সরদারদেরও আমন্ত্রণ করা হত।

ঢাকার কয়েকটি বাড়ির বৈঠকখানায় উর্দু মোশায়েরার (শের শায়েরী) ব্যবস্থা করতেন। যখন কবিতা পাঠ করা হতো সুর করে তখন উপস্থিত শ্রোতাদের কণ্ঠ থেকে মারহাবা ধ্বনি উচ্চারিত হতো। শের শায়েরীর আসর জমে উঠত।

আজকাল ঈদ কালচারের একটা মজার আকর্ষণ ঈদ কার্ড। ভিড়ের মাঝে পথ চলতে চলতে আকর্ষণীয় ডিজাইনের বর্ণিল কার্ড দেখে থমকে দাঁড়াতে হয়। প্রিয়জনের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য ঈদ কার্ড এখন বিশ্বের সব দেশেই প্রচলন রয়েছে। কার্ড ছাড়া আরও থাকে নানা রকম উপহার সামগ্রী। উপহার পেলে সবাই খুশি হয়। উপহার দেয়া নেয়ার উদ্দেশ্য হল আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়া। এ সুন্দর বিধানটা আমাদের কাজে লাগানো উচিত।

দুই ঈদ উপলক্ষেই প্রকাশিত হয় জমকালো ঈদসংখ্যা পত্রিকা। রোজার ক'দিন পূর্বে বিভিন্ন সাময়িকী ঈদ ফ্যাশন সংখ্যা বের করে থাকে। এতে বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাকের ছবি ও ফ্যাশন জগতের তথ্য থাকে।

ঈদ উপলক্ষে বঙ্গভবন থেকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত সড়ক এবং সড়ক দ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকা, বাংলা ও আরবীতে ঈদ মোবারক লেখা ছোট ছোট ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়। ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ দালানকোঠাসমূহ বাতি দিয়ে সাজানো হয়।

ঈদ উপলক্ষে ঢাকার সংস্কৃতির অঙ্গনে নানা স্থানে গানের জলসা বসত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর জমত অভিজাত মহলে, সাধারণত ঢাকাইয়াদের প্রিয় ছিল কাওয়ালী গানের আসর। কাওয়ালীর মজলিস সারারাত ধরে চলত।

ঢাকার ঈদ বিনোদন সম্পর্কে প্রাক্তন সচিব ও নাট্যকার জনাব সাঈদ আহমেদের স্মৃতিচারণ আমাদের আনন্দ দেয়। তিনি জানান বড় বেশি মজার সময় কাটত। ইসলামপুরের রাস্তায় হরেক রকমের খেলা তামাশা চলত। তবে একটা তামাশা খুব উত্তেজনাপূর্ণ চলত ১২ টার সময় লায়ন সিনেমার প্রাঙ্গণে খুব হৈ চৈ; কারণ কেবল এই হলেই ১২ টার সময় Picture দেখানো হতো। আর অন্য কোন হলে Morning show বন্দোবস্ত ছিল না। সম্ভবত ১৯৩৯ সালে প্রথম এই Show 'র প্রথা চালু হয়। একমাত্র মুসলমানদের হল ছিল বলেই এই Show দেখানো হতো।[২৪]

১৯৯৪ সালে ঈদুল ফিতরের পরের দিন। চলচ্চিত্র পরিচালক হাফিজউদ্দীন বাংলাদেশ মাঠ প্রাঙ্গণে চলচ্চিত্রের কয়েকজন শিল্পী নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেন। এর নাম ছিল "পুরনো ঢাকাবাসীদের ঈদ আনন্দ উৎসব' এতে বিপুল দর্শকের সমাগম হয়েছিল। এ অনুষ্ঠান আমি নিজেও উপভোগ করেছি।

www.pathagar.com

ঈদের পোশাক ও ফ্যাশন শো

ঈদ পোশাকে মোগল পুরুষেরা সিল্ক ও মসলিনে তৈরি চাপকান ও চোগা পরিধান করতেন। অনেকে পায়জামা, পাঞ্জাবী, শেরওয়ানী, আংগরাখা ও কটি পরে সজ্জিত হয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। সাধারণ মানুষ লুঙ্গি, কোর্তা ও টুপি পরতেন। সেকালে নানা রকমের টুপীর প্রচলন ছিল লক্ষণীয়। মোগল রাজকন্যারা মসলিনের ও জামদানীর তৈরি নানা রকম পোশাকের ফ্যাশন প্রবর্তন করেন। সিল্ক ও মসলিন ছিল মেয়েদের উৎসব অনুষ্ঠানের পোশাক। ঢাকার বাঙালি মেয়েরা ঘাঘরা শাড়ি ও ব্রোকেডের সালোয়ার কামিজ পরতেন। ব্রিটিশ আমলে এসে এদেশের পোশাকে পরিবর্তন দেখা দেয়।

ঈদ উৎসবে ঢাকার বিভিন্ন মার্কেটে দেখা যায় ভারত ও পাকিস্তানে তৈরি মেয়েদের নানা রকম পোশাক। ছেলেদের বিভিন্ন রকমের পাঞ্জাবী। বিভিন্ন ডিজাইন ও তৈরি পোশাকে ঢাকার ফ্যাশন হাউসগুলোও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মিলনায়তনে বা পাঁচতারা হোটেলে তৈরি পোশাক প্রদশনী ও বর্ণাঢ্য "ফ্যাশন শোর আয়োজন করে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে তৈরি এসব বাহারী পোশাক মানুষের মন কেড়ে নেয়। কয়েকটি ফ্যাশন শো দেখে আমি নিজে মুগ্ধ হয়েছি।

ঈদের খাবার ও অতিথি আপ্যায়ন

ঈদের দিন ঢাকাইয়াদের বাড়িঘরে নানা ধরনের খাবার পাক করা প্রাচীনকালের ঐতিহ্য। রমজানের চাঁদ দেখার পরই মেয়েরা সেমাই তৈরি করার জন্য তৎপর হয়ে উঠত। সেকালে মেশিনের তৈরি সেমাই বাজারে পাওয়া যেত না। হাতে পাকানো সেমাই ঘরে বসে তৈরি করতে হতো।

এসব সেমাই ঈদের দিন সকালে গরম পানিতে ধুয়ে ঘন দুধ দিয়ে রান্না করা হতো। তারপর তা ছোট ছোট পিরিচে ঢেলে উপরে কিসমিস পেস্তা বাদাম ছড়িয়ে দেয়া হত।

ঈদের দিনে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীগণ কিছু মিষ্টি হালুয়া ও নতুন কাটা খেজুর খেতেন। এদিনে নিজে মিষ্টি খাওয়া এবং অপরকে খাওয়ানো রাসূল (সাঃ)-এর একটি সুন্নত।

ঢাকার খানদানী খাবারের কথা বলতে গেলে আশ্চর্য হতে হয়। ঈদের নামাজ শেষে ঢাকাইয়ারা পাড়া-পড়শি এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় যেতেন সালাম করার জন্য। ঢাকাইয়ারা অতিথি পরায়ণ।

www.pathagar.com

বাড়িতে অতিথিরা ঈদ মিলনের জন্য আসতে আরম্ভ করতো। নানা রকম পুষ্পগন্ধে তৈরি সুগন্ধী আতর ঘরে সাজানো থাকত অতিথিদের জন্য দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ থেকে আসতো আতর এবং এসব গোলাপী আতরের কদরই সবচেয়ে বেশি হত। অতিথিরা ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গোলাপ পানি ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হত।

নানা ধরনের খাবার তৈরি ছাড়াও খাবার পরিবেশনেও ঢাকাইয়ারা তাদের সুরুচির পরিচয় দিয়েছে। ঢাকার অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে বিখ্যাত তোড়াবান্দি খানা মেহমানদের সামনে পরিবেশন করা হত একটি কাঠের খোঞ্চায় বা সেনীতে লাল বানাতের নিচে সারি সারি বরতন ও পেয়ালা সাজিয়ে রাখা হত। এই খাবারের মধ্যে থাকত চার রকমের রুটি, চার রকম চাল (পোলাও), চার রকমের নান জাতীয় রুটি, চার প্রকার কাবাব, চার রকমের মিষ্টি, পনির, বোরহানি, চাটনি এবং আচার অর্থাৎ প্রত্যেক পদের খাবার চার প্রকার থাকত। মোট চব্বিশ পদের নিচে থাকত না।

তোড়াবান্দি খানা : চার প্রকার রুটি হল, পনির সংযুক্ত, ঘি দুধের বাকরখানি, শীরমাল, কিমা পরটা বা কাবুলী পরটা ও নার্গিসী পরটা বা মোগলাই পরটা, চার প্রকার চাল বলতে, মোরগ পোলাও ও খাসীর বিরিয়ানী, সাদা পোলাও, বুন্দিয়া বা কোফতা পোলাও, চার প্রকার নান বলতে, দোস্তীরুটি, হাওয়াই বা চাপাতি, চালের রুটি, গাওদিদা বা গাওজোবান।

চার রকমের কাবাব হল, শামী কাবাব, হান্ডি কাবাব, টিকিয়া কাবাব ও মোরগা মোসাল্লাম।

চার রকমের মিষ্টি হল, মাকুতী জর্দা, ফিরনী এবং ফালুদা। এছাড়াও বোরহানী, চাটনী, পনির এবং আচার অর্থাৎ সর্বমোট চব্বিশ পদের খানা পরিবেশন করা হত।

এ খাবার ঢাকার বিয়ের পানচিনি, ঈদ উৎসবে মেহমানদের সামনে পরিবেশন করা হত। এসব ছাড়াও অন্যান্য খাবার রান্না করা হত যেমন লাচ্ছা সেমাই, ফিরনি সেমাইয়ের জর্দা, বিরিয়ানি, নানা রকমের মিষ্টি ও খিচুড়ি। ঈদ উৎসবে ঢাকাইয়া দরিদ্র পরিবারেও ঈদের আয়োজন বেশ ভালভাবেই করা হত। ভোজন বিলাসী ঢাকাইয়াদের আরেকটি লোভনীয় বিবরণ দিয়েছেন সংগীত শিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু। তিনি মোরগ পোলাও, কাবাব রেজালা, কোরমা, কালিয়া, শামী কাবাব, মুরগির কাবাব, সেমাই এর জর্দা, ফিরনি ইত্যাদি খাবারের উল্লেখ করেছেন।[২৫]

www.pathagar.com

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান জানান, ঢাকা শহরে এক সময় ছিল মোরগ পোলাওয়ের প্রচলন এখনও ঢাকায় মোরগ পোলাও আছে। কিন্তু তা আগের মত আর হয় না। আগেকার দিনে প্রচুর ঘি দেয়া হত এবং মুঠো মুঠো বাদাম পেস্তার কুঁচি দেয়া হত। গোশত এমন নরম হত যে মনে হত হাড় থেকে আলাদা হয়ে গেছে, সে সময় মোরগ পোলাওয়ের মুরগি দুধদিয়ে ধোওয়া হত একবিন্দু পানিও ব্যবহার করা হত না।[২৬]

ঢাকার প্রধান রাজকীয় খাবারের সৃষ্টি হলো মোরগ পোলাওতে। ঢাকা অঞ্চলে মোরগ-মুরগি খাঁটি ঘি এর অভাব ছিল না। এখনও ঢাকা শহরে মোরগ পোলাওয়ের প্রচলন রয়েছে। ঢাকার ঈদের খাবারের মেন্যুতে আজকাল ফাস্টফুড নতুন সংযোজন হয়েছে। এছাড়া কাষ্টার্ড, পুডিং, নুডুলস, চটপটি প্রভৃতি খাওয়া হচ্ছে।

ঢাকাইয়াদের ঈদ উৎসবের অতিথি আপ্যায়নের নিম্নলিখিত স্মৃতিচারণ করেছেন বিশিষ্ট দার্শনিক অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমাদের এক বন্ধু ঢাকার মৌলভী বাজারে বাস করত পল্টন ময়দানে নামাজ আদায় করে মুসলিম হলের উদ্দেশ্য রওয়ানা দিতেই দেখি সে যেন চিলের মতো ছোঁমারার উদ্দেশ্যে তাকিয়ে রয়েছে। আমি তার কাছে আসতেই আমাকে পাকড়াও করে তার বাসাবাড়িতে নিয়ে যাবে। আপত্তি করবার সাধ্য ছিল না। কারণ সে ছিল এক নাছোড়বান্দা। সেখানে যেয়ে দেখলাম তার জায়গীর বাড়ির কর্ত্রী আমার জন্য হরেক রকম খাবার তৈরি করে তার ছেলেকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি কেবল নাস্তার আয়োজন করেননি। অর্থাৎ সেমাই, নিমকি, সিঙ্গারাতে তা সীমাবদ্ধ করেননি। মুসাল্লাম, পরোটা, পোলাও, কোরমা, কোপ্তা প্রভৃতি মোগলাই খানাও তাতে সাজিয়ে রেখেছেন।

অল্প বয়সে বিধবা হয়েও দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। ছেলেরা একটু বড় হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রকে তাদের মাষ্টার নিয়োগ করতেন। যারা তার নিয়োগ আহলাদ সহকারে গ্রহণ করতো তাদের আদর সোহাগ করে মাসিক মাসোহারার সঙ্গে ভাল খানাপিনাও যোগান দিতেন। সেদিনের তার ঈদের রান্নার স্বাদ এখনও যেন জিহবায় লেগে আছে। এখানেই যে লজিজ বা সুস্বাদু খানার শেষ হয়নি। প্রায় সপ্তাহব্যাপী তার স্বাদ পেতে হয়েছে।[২৭]

বর্তমান সময়ে মানুষের জীবন যাত্রার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন ফাস্ট ফুডের যুগ। আমরা অল্প দামে অল্প সময়ে খাবার পেতে চাই। ঢাকার অনেক খাওয়া ব্যয় সাপেক্ষ এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে তৈরি করতে হয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও রসনা বিলাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই ঢাকার অনেক প্রচলিত খাদ্য বিলুপ্ত হয়ে কল্পকথা বা রূপকথার সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

ঈদুল আযহা

ঢাকায় মুসলিম সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে ঈদুল আযহা বা কোরবানী ঈদ। ঈদুল আযহার সময় ঢাকা শহর এক নতুন রূপ ধারণ করতো।

মোগল আমলে ঢাকায় কতটা জাঁকজমক সহকারে ঈদুল আযহা উদযাপন করা হত মীর্জা নাথানের বর্ণনা থেকে এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ তুলে ধরছিঃ

উৎসবের দিনে বন্ধু জন, আত্মীয়-স্বজন ও রাজকর্মচারীরা একে অন্যের নিকটে যেতেন এবং ঈদ উপলক্ষে তাদের অভিনন্দন জানাতো সেনাধ্যক্ষ সুজাত খান। এই আনন্দ উৎসবের দিনটিতে বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়নের নিমিত্তে একটি সামাজিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ঈদ উপলক্ষে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে উপহার উপঢৌকন বিতরণ করা হত। ঈদুল আযহার উদযাপন বর্ণনা করে মীর্জা নাথান বলেন, সকলেই ঈদগায় গমন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামে ইমাম খুৎবা পাঠ করেন। এই অর্থ দিয়ে বহু অভাবগ্রস্ত লোকের জীবন ধারণের সংস্থান হয় এবং তারা সুখী হয়। শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতি জ্ঞাপনের শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। বাড়ি প্রত্যাবর্তনের পর আমি কোরবানী করলাম। সুন্দর গায়িকা লাবণ্যময়ী নর্তকী ও মনোরম স্বভাবের গল্পকারদের নাচ, গান ও গল্পের মধ্যে দিয়ে সারাদিন ও সারারাত্রি ব্যাপী ভোজের আয়োজন হয়েছিল। কারখানার শ্রমিকদেরকে উপহার দেয়া হয়েছিল।[২৮]

এখানে অধিকাংশ বাড়িতেই কোরবানী দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, কোরবানী দেয়া কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পর্যায়ে চলে যায়। অনেকে হয়তো ১০/১২টি গরু কোরবানীর জন্য কিনে নিয়ে আসেন। সংখ্যা নিয়েও প্রতিযোগিতা হয়। এখনকার ধনী ব্যক্তিরা কোরবানীর গরু কেনার ক্ষেত্রে গরুর আকৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কেউ আবার হাটের সর্বশ্রেষ্ঠ গরুটি কেনার রেকর্ড স্থাপন করেন। অবশ্য এই রকম প্রতিযোগিতায় কোরবানীর মাহাত্ব হারিয়ে যায়। কোরবানীর মাংস বিতরণের সময় ছেলে-মেয়েদের শ্বশুর বাড়িকে প্রথম অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

সাধারণত তারা গরুর পিছনের রানটি একটি বড় ডালার উপর হাতের নক্সা করা চাদরে ঢেকে পাঠিয়ে দেন। বেয়াই বাড়ি থেকেও আরেকটি রান আসে।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম জানিয়েছেনঃ চুড়িহাট্টার পীর সাহেব একবার উত্তর ভারত থেকে কোরবানীর জন্য আনিয়েছিলেন মস্ত এক উট। সে উট

www.pathagar.com

দেখার জন্য দর্শকের কি ভিড়। ছোট ছেলে-মেয়েরা যারা উটের শুধু নামই শুনে এসেছে চোখে দেখেনি তাদের চোখে মুখে সে এক মহাবিস্ময় অভিব্যক্তি। একালে যেমন মাঠে ময়দানে এমনকি রাস্তায় রাস্তায় গরুর হাট বসে। সেকালে তেমনটি ছিল না। সেকালে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল কম। কোরবানীর পশুর সংখ্যা ছিল তেমনি সীমিত। ছেলেবেলায় নামকরা গরুর হাটের কথা শুনেছি। মিরপুরের গরু ছাগলের হাট, সোয়ারী ঘাটের হাট, নদীর ওপারের জিঞ্জিরার হাট।[২৯]

ঢাকা শহরের বিভিন্নস্থানে মোট ১৬ টি কোরবানীর পশুর হাট বসে। এ ছাড়া ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্যান্য স্থানেও হাট বসে থাকে।

ঢাকাইয়াদের বিভিন্ন ঐতিহ্যের মতোই কোরবানীর ঈদের মিরকাদিমের গাভী কেনার সৌখিনতা রয়েছে যুগ যুগ ধরে। মিরকাদিমের সাদা গাভী শুধু সুন্দরের জন্যই নয়। এর মাংস বেশ উপাদেয়। মাংসে খুব ভালো তেল থাকে।

আজকাল ঈদুল আযহার সময় ঢাকার বিভিন্ন হাটে ভারতের রাজস্থান থেকে উট এবং দুম্বা আমদানি করে আনা হচ্ছে। কয়েক শত উট কোরবানীর হাটে উঠে থাকে। বিক্রিও হয় অনেক। বছরের অন্যান্য সময়ও গাবতলীর হাটে উট বিক্রি হয়ে থাকে।

ঢাকাইয়াদের কোরবানী ঈদের সময় মাংস দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরির ঐতিহ্যমণ্ডিত দিক রয়েছে। ঢাকাইয়াদের এ ধরনের খাবারের অনেকেই গুণকীর্তন করেছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিল্প প্রেমিক শাহেদ সোহরাওয়ার্দী তার দেশ-বিদেশের রান্না নিয়ে লেখা একটি গ্রন্থে ঢাকাবাসীর খাওয়া-দাওয়াকে পৃথিবীর অতুলনীয় সুস্বাদু খাদ্য বলে অভিহিত করেছিলেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁর গ্রন্থে ঢাকাইয়াদের নানা ধরনের মাংসজাত দ্রব্যের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

ঢাকায় যেভাবে কোফতা তৈরি হয় তা অন্য কোন খানে খুব কমই দেখা গেছে। কাঁচা গোশতের কোফতা, সিদ্ধ গোশতের কোফতা, এবং কাঁচা ও সিদ্ধ গোশতের মিশ্রিত 'কোফতা, খাশতা কোফতা, কোফতার কালিয়া, কোফতার কোরমা, তন্মেধ্যে বুন্দিয়া অর্থাৎ মটর দানা সমান থেকেই দুই সের পর্যন্ত কোফতা তৈরি হত। বেরেঞ্জী কোফতা যার মধ্যে পনির আর ফলফলারী ভরা হয় । মিঠা কোফতা যার চলন এখন কম হয়ে গেছে। এমন সুবর্ণ আর সুস্বাদু কোফতা এখানে তৈরি হয় এবং অধিক পরিমাণ উত্তম কোফতা তৈরি করার

www.pathagar.com

লোক এখানে আছে যা অন্য কোথাও নেই।[৩০] কোফতা ছাড়াও ঢাকাইয়ারা কোরবানীর মাংস দিয়ে অনেক রকম খাবার তৈরি করে থাকে।

কোরবানীর রান্না করা মাংস কিভাবে দীর্ঘদিন ঘরে রেখে খাওয়া যায় তার পদ্ধতি ঢাকার মহিলাদের জানা ছিল। মাংস দীর্ঘদিন ঘরে রান্না করে রেখে তা মহররমের আশুরার দিন সিন্নী পাক করে বিলান হত। আবু যোহানুর আহম্মদ জানিয়েছেন তখনকার জাহাজী কালিয়ার তো তুলনাই ছিলনা। তাহা গোশত এবং মাছ দ্বারা বহু রকম পাক হইত। তাহা রন্ধন কৌশল একমাসেও খারাপ হইত না। দূর দূরান্তের জাহাজে ভ্রমণকারীরা এই খাবার সাথে করিয়া লইয়া যাইত।[৩১] এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায় ঢাকাইয়ারা কি রকম উদ্ভাবনী সৃষ্টির অধিকারী এবং রন্ধনকলায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ঈদ-উল-আযহার শিক্ষা চিরন্তন ও শাশ্বত। এ ঈদ মানুষকে সর্বদাই আদর্শের পথে উজ্জীবিত করে ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের পথ দেখায়।

ঈদের ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ আমলে খ্রিষ্টানদের ক্রিসমাস উৎসব সরকারিভাবে জাঁকজমকসহকারে উদযাপন করা হত। তারপর দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছিল জাঁকালো এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, সরকারি ছুটির পরিমাণ ঈদ থেকেও পূজার জন্য বেশি ছিল। মুসলমান চাকুরিজীবীরা ঈদের ছুটি বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানালেও তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমানদের ঈদ উৎসবকে গুরুত্ব দেয়নি।

ঈদ উৎসবকে আমরা শুধু ঘরে প্রার্থনায় সীমাবদ্ধ রেখেছি। আমাদের উপর দিয়ে দুইশ' বছর কি বিপদের মধ্যেই অতিবাহিত হলো। নির্যাতন আর জুলুমে জীবন বাঁচানো যখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল তখন আনন্দ উৎসব করব কখন। দুইশ' বছর এদেশবাসী কান্নাকাটি করে কাটাল, এই সময় আমাদের জীবন যাত্রা থেকে স্বাচ্ছন্দ্য উৎসব, অনুষ্ঠান জাঁকজমক কমে গেল। কিন্তু ধর্ম পরায়ণতা বৃদ্ধি পায়। এই জাতীয় সংকটের দিনে ঢাকাবাসী ঈদ উৎসবকে সীমিত করে নাই।

১৯৪৭ এর পূর্বে বাংলাদেশে ঢাকা শহরেই জাঁকজমকসহকারে ঈদ উৎসব পালন করা হতো। ঢাকা ছিল মোগল ও পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর। তাই মোগল ঈদের প্রভাব ছিল অধিক। এখানে নবাব নায়েব নাজিম, জমিদার এবং শরীফ ব্যক্তিরা থাকতেন। মুসলমানেরা বিরাট আনন্দ উৎসব ও ভ্রাতৃসুলভ মনোভাবের ভিতর দিয়ে ব্রিটিশ আমলে ও ঢাকায় ঈদ উৎসব জাঁকজমকসহকারে উদযাপন করতেন। ইংরেজ আমলে এসেও ঢাকার ঈদের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাব কতটা গভীরে বিস্তার করেছিল তা এতে অনুমান করা যায়।

www.pathagar.com

জেমস ওয়াইজ বাংলাদেশের ঈদ সম্পর্কে লিখেছেন, ১৮৭৪ সালে একবার ঈদের নামাজ পড়ার জন্য কয়েক গ্রামের লোক সমবেত হয়েছিল লক্ষ্যা নদীর তীরে। কিন্তু জামাতের লোকদের মধ্যে এমন একজনকেও পাওয়া গেল না যিনি ইমামতি করতে পারেন। নদীপথে যাচ্ছিলেন ঢাকার বিশ বছর বয়স্ক এক যুবক। শেষে তাকে আনা হল ইমামতি করতে।[৩২]

ব্রিটিশ আমলে সামাজিকভাবে ঈদ উৎসব পালন করা হত। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর খুব সমারোহের সঙ্গে প্রথম বছরে ঈদ উদযাপিত হল পাকিস্তানে। আশরাফ-উজ-জামানের দেয়া তথ্য জানা যায় "পূর্ব পাকিস্তানের চীফ মিনিস্টার খাজা নাজিমউদ্দীন নামাজ পালন করেছিলেন সকলের সঙ্গে। নামাজ শেষে ঢাকার পেশ ইমাম দীর্ঘ সময় ধরে মোনাজাত করলেন পাকিস্তানের স্বস্তি ও শুভ কামনা করে। ঈদ উৎসব সরকারিভাবে উদযাপিত হলো ঢাকায়। পূর্ব বাংলার ইংরেজ গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক বোন তার সরকারি বাসভবনে ঈদ পার্টির আয়োজন করে আমন্ত্রণ জানালেন বৈদেশিক কূটনীতিকদেরসহ ঢাকার সমস্ত অভিজনকে। করাচি থেকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঈদের মোবারক বাণী পাঠালেন পূর্ব পাকিস্তান বাসীদের। সরকারিভাবে সমর্থিত হয়ে গেল দেশে ঈদ পালন।[৩৩]"

ঢাকার সমাজ শুধু খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে ঈদের আনন্দকে সীমাবদ্ধ রাখে না। ঢাকার মানুষ উৎসব প্রিয়। পূর্বে উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন উৎসবের জন্য এই শহরের খ্যাতি রয়েছে। কয়েকটি উৎসব ছিল খুবই আকর্ষণীয়। ঈদ, মহররম ও জন্মাষ্টমী। এই তিনটি উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল মিছিল। ঢাকায় প্রাচীনকালে জাঁকজমক সহকারে ঈদ, মহররম, ও জন্মাষ্টমী মিছিল উদযাপিত হতো। ঈদের মিছিল বা আনন্দ শোভাযাত্রা হল ঈদ উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হত এ মিছিল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈদ মিছিল ঃ মোগল ও নায়েব নাজিম আমল

এ মিছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গে কেবল ঢাকা শহরেই হত। অন্য কোথাও হত বলে জানা যায় না। রাজাবাদশাহদের বিক্রম প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে অনেক দেশেই মিছিল বা শোভাযাত্রার প্রচলন ছিল। মোগল সম্রাটদের আমলে দিল্লীতে ঈদের সময় ঈদ মিছিল বের করা হত। দিল্লীতে মোগল সম্রাট হুমায়ুন ঈদ সমারোহের আয়োজন করতেন। এতে তার সিপাহীরা নানারকম লক্ষ্যভেদের কলাকৌশল প্রদর্শন করতো। মোগল সম্রাটদের অভিষেক দিনে বর্ণাঢ্য রাজকীয় মিছিল রাজধানী পথ অতিক্রম করত।[৩৪] ঈদের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম প্রধান অংশ হচ্ছে ঈদের মিছিল। এসকল মিছিলে মোগল সম্রাটগণ কিংবা তার পরিবারের সদস্যগণ নেতৃত্ব দিয়েছেন। শিল্পী ঈদের মিছিলের আনন্দদায়ক অনুভূতিকে নানাভাবে নানা বর্ণে ক্যানভাসে আবদ্ধ করতেন।[৩৫]

মোগল সুবেদারগণ ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের সময় থেকে ঈদ আনন্দ উৎসব উৎকর্ষ লাভ করে তা মীর্জা নাথানের বর্ণনায় পূর্বে উল্লেখ করেছি।

সুবেদার ইসলাম খাঁ যে সময় ঢাকা আগমন করেন তখন রমজান মাস ছিল। প্রথম বছরই ঈদের আনন্দ জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছিল। একদিকে রাজধানী স্থাপনের আনন্দ অপরদিকে ঈদের আনন্দ। ইতিহাস বিদদের ধারণা মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁ চিশতী ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের সময় থেকেই ঈদের মিছিল বা আনন্দ শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল। এ সম্পর্কে আশরাফ-উজ-জামান লিখেছেন ঃ ঢাকার মোগল শাসনকর্তা ইসলামখানের আমল থেকেই ঢাকায় ঈদ উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়। খুব ধুমধাম করে ঈদ উৎসব পালিত হতো তখন। ইসলাম খাঁ নবনির্মিত লালবাগ মসজিদে গিয়ে নামাজে যোগ দিতেন। ঈদের মিছিল বের হতো। কেল্লা থেকে ঘোড়সওয়ার হয়ে বেরিয়ে আসতো ফৌজি বহর যোগ দিত এসে মিছিলে। হাতিশালা থেকে হাতির দল নিয়ে এসে নানারকম সাজে সেজে মাহুতরা যোগ দিত মিছিলে।[৩৬]"

www.pathagar.com

ইসলাম খাঁ ঢাকা কেল্লায় (বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে) পুরাতন কেল্লায় বসবাস করতেন। কেল্লার মধ্যে বিচারালয়, টাঁকশাল, এবং রাজকীয় মহল ছিল। অন্যান্য মোগল সুবেদারগণ অনেকেই এখানে বসবাস করেছেন। বর্তমানে সে প্রাসাদ আর অবশিষ্ট নেই। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানী লাভের পর ইংরেজ এজেন্ট লেফটেন্যান্ট সুইটেন (বাংলার শাসনকর্তা) তার কার্যভার গ্রহণ করার জন্য এখানে এসেছিলেন। তখন নায়েব নাজিম জেসারত খান ইসলাম খানের দুর্গ ছেড়ে বড় কাটরা প্রাসাদে বসবাস করতে থাকেন। মোগল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা কর্তৃক ১৬৪৪ সালে বড় কাটরা প্রাসাদ নির্মিত হয়।

ঢাকা দুর্গের স্থানে নির্মিত বর্তমানে ঢাকাকেন্দ্রীয় কারাগার। এখানে ছিল মোগল প্রশাসনের সচিবালয়। ঢাকার তৃতীয় মুগল গভর্নর ইবরাহীম খান ফতেহ জং কেল্লার ভিতরে তাহার প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কেল্লার পূর্ব দরজা ও পশ্চিম দরজা নামে দুইটি দরজা ছিল। ইহাদের তৎকালীন সীমানা এখনও এই নামেই পরিচিত। ঢাকা কেল্লার চতুর্দিকের অঞ্চল বাদশাহী বাজার (চকবাজার), উর্দু বাজার, আতিসখানা, বকশীবাজার, পীলখানা ও মাহুতটুলী, দেওয়ানবাজার, আদি নামেই পরিচিত।

নবাব সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৭ সালে পতনের পর ঢাকার নায়েব নাজিমরা (উপনবাব) কোম্পানী সরকারের অধীনে ঢাকার শাসক ছিলেন।

১৭৬৫ সালে ঢাকার নিমতলী নবাব প্রাসাদ নির্মিত হওয়ার পর নায়েব নাজিম (উপ নবাব) বড় কাটারা প্রাসাদ ছেড়ে এখানে বসবাস শুরু করেন। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুল করীম নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন। নায়েব নাজিমগণ ইসলাম খানের কেল্লা বা দুর্গের মধ্যে বাস করতেন। কোম্পানি দেওয়ানী লাভের পর ইসলাম খাঁনের কেল্লা ইংরেজ কর্মকর্তারা দখল করে নেয় এবং নায়েব নাজিম বড় কাটারা প্রাসাদে চলে যান।[৩৭] নিমতলী প্রাসাদ নির্মিত হওয়ার পর নায়েব নাজিমগণ সেখানে চলে যান। কোম্পানি দেওয়ানী লাভের পর নিমতলী প্রাসাদ নির্মিত হয়। বার দরজাবিশিষ্ট দরবার গৃহটি বারদুয়ারী নামে অভিহিত। নাজিমরা বাস ভবন থেকে নহবত খানার ফটক দিয়ে এখানে এসে দরবার বসাতেন। ছয়জন নবাব এখানে দরবার করেছেন, তারা হলেন জেসারাত খান (১৭৬৫-১৭৭৮) হাশমত জং (১৭৭৮-১৭৮৫) নুসরাত জং (১৭৮৫-১৮২২) শামসুদ্দৌলা (১৮২২-১৮৩১) কামরুদ্দৌলা (১৮৩১-১৮৩৪) ও গাজীউদ্দিন হায়দার (১৮৩৪-১৮৪৩) উল্লেখিত সময় পর্যন্ত নায়েব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অত্র এলাকায় নিমগাছের সমাহার থাকায় প্রাচীন কালে থেকে এলাকাটি নিমতলী নামে পরিচিত। এক সময় গোটা মহল্লাটি বাগে মুসা খার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

www.pathagar.com

ঈদ মিছিলের চিত্রমালা

নিমতলী প্রাসাদে বসবাসকালীন সময়ে নায়েব নাজিমদের সময়েও অনুষ্ঠিত হয় ঈদের মিছিল। তার দরবারে সে সময়ের আঁকা ঈদ ও মহররম মিছিলের ৩৯টি ছবি জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণ করা আছে। ছবিগুলির আকার ২৪×১৮ ইঞ্চি। ২২টি ঈদের মিছিল, ১৭টি মহররম মিছিলের ছবি।[৩৮] তার মধ্য থেকে ১৭টি ছবি গ্যালারীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। বাকিগুলি ষ্টোরে রাখা হয়েছে।

ঢাকা নগর জাদুঘরে-এর প্রতিচিত্র প্রদর্শিত হচেছ। জল রং চিত্রগুলি ডঃ আহমেদ হাসানদানী পুরানো ঢাকার বেচারাম দেউরীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসনাত সাহেবের বাসা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তার পারিবারিক সূত্রে জানা যায় মহররম মাসে হাসনাত সাহেব ছবিগুলির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। এতে বিপুল দর্শকের সমাগম হত। সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর, হাসানদানীকে পরিচয় করিয়ে ছিলেন খান সাহেব আবুল হাসনাতের সঙ্গে। হাসনাত সাহেব একদিন দানীকে আমন্ত্রণ জানালেন এক নৈশভোজে। "দানীর ভাষায় আতিথেয়তার জন্য ঢাকা ছিলো বিখ্যাত এবং তার রেশ তখনও ফুরিয়ে যায়নি। হাসনাত সাহেব আমার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন টিপিক্যাল সব ঢাকাই খাবার। সে এক এলাহী কাণ্ড। যেন কোন নবাবের বাড়িতে খেতে এসেছি। খাওয়া দাওয়ার পর বললাম, মহররম ও ঈদ মিছিলের ছবিগুলো দেখতে চাই। সেগুলো ঝোলানো ছিল একটি কামরায়। হাসনাত সাহেব সে ঘরে নিয়ে আমাকে বললেন, প্রফেসার দানী, দিস ইজ ইয়োরস অ্যাণ্ড ইউ ক্যান টেক দেম। আমি (হাসান দানী) তো হতবাক। আর হাসনাত সাহেব এমনই ভদ্রলোক যে তিনি একবার উল্লেখ করলেন না ছবিগুলো তার দান হিসাবে গৃহীত হোক। জাদুঘরে তখন জায়গার অভাব। কিন্তু আমি ছবিগুলো নিয়ে এসে দেয়ালের বেশ উঁচুতে সেগুলো টাঙানোর ব্যবস্থা করলাম। এভাবে ঢাকা জাদুঘরের সংগ্রহে এলো অমূল্য এক সম্পদ।[৩৯] আবুল হাসনাতের পূর্বে চিত্রগুলো ছোট কাটরায় বসবাসরত নবাব শায়েস্তা খা'র এক বংশধরের সংরক্ষণে ছিল।

নবাব নুসরাত জংয়ের দরবারের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আলম মুসাব্বীরসহ কয়েকজন শিল্পি ছবিগুলি জল রঙে এঁকেছিলেন। ছবি ইতিহাসের উপাদান। ছবি দেখে বোঝা যায় নবাবী আমলের ঈদ মিছিলের বর্ণাঢ্য রূপ ও তার ব্যাপকতা।

এস এম তাইফুর ছবিগুলোর বিবরণে বলেছেন, "নবাব নুসরাত জং এর সমকালের বহু সূক্ষ্ম চিত্র শিল্পের দৃষ্টান্ত আজও ঢাকায় বিদ্যমান আছে। সেই সময়কার পূর্ণাঙ্গ ঈদ ও মহররম মিছিলের হাতে আঁকা ছবি আমাদের দৃশ্যপটে

www.pathagar.com

আজও প্রতীয়মান। সেই স্থায়ী জলরংয়ের ছবিগুলো এঁকেছিলেন সেই যুগের কতিপয় রাজকীয় দরবারের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীরা। যা ঢাকা জাদুঘরে আজও বিদ্যামান। সেই ছবিগুলো দ্বারা আজো আমরা সে যুগের নবাবদের আনুষ্ঠানিক ও সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় পেয়ে থাকি। ছবিগুলো সামগ্রিক বর্ণনা ভঙ্গি এতই পুষ্ট ও নিখুঁত যে আজো একজন সাধারণ মানুষ তৎকালীন স্থান ও অধিবাসীদের অবস্থা অতি সহজেই উপলব্ধি বা নির্ণয় করতে সক্ষম। সেই ছবিগুলো মোগল সংস্কৃতির সর্বশেষ নিদর্শন। সে সব চিত্রশিল্পীদের মধ্য হতে আলম মুসাব্বীরের নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।[৪০]

নায়েব নাজিম নুসরাত জং বাহাদুর।

www.pathagar.com

নিমতলী নবাব প্রাসাদের দেউড়ী।

ঈদ মিছিলের অন্তর্ভুক্ত এলাকা

নিমতলী প্রাসাদ থেকে এ মিছিল শুরু হয়ে তখনকার বড় বড় রাজপথ অতিক্রম করত। চিত্রগুলি দেখে আমরা জানতে পারি নায়েব নাজিমের ঈদ ও মহররম মিছিলে নবাব কাটারা, দেওয়ান বাজার, হোসেনী দালান, বকশী বাজার, বেগম বাজার, বেচারাম দেউরী, ছোট কাটারা, বড় কাটারা, চকবাজার, গিরদে উর্দু রোড এই সব মহল্লা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মিছিলের সামনের সারিতে নায়েব নাজিম নুসরাত জং হাতির পিঠে বসতেন। বরদার (বাহক) কৃত্রিম মুক্তা ও রৌপ্য তারের অলংকারযুক্ত শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক ছাতা তার উপরে তুলে ধরতেন। নানা রকম জরি আর লাল মখমল কাপড় দিয়ে হাতি সাজানো হত। আরও থাকত ঘোড়া, উট, পালকি, ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি, লাল, নীল, সবুজ, হলুদ সিল্কের শত শত নিশান মিছিলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিত। নবাবদের সুসজ্জিত বাদ্যযন্ত্রের দল নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নিয়ে চলত। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকত ঢোল, বাঁশি, কাড়া, নাকাড়া শিঙা ঈদ মিছিলে হাতির পিঠে হাওদায় বসে অভিবাদন জানাতেন

www.pathagar.com

নায়েব নাজিম নুসরাত জং বাহাদুর। তার পেছনের হাতিতে থাকতেন নবাবের ছোট ভাই শামসুদ্দৌল্লা। ঈদের মিছিলে নায়েব নাজিমগণ নেতৃত্ব দিতেন। নবাবদের সঙ্গে হাতির পিঠে সাওয়ার হতেন ঢাকার জমিদার ও সম্মানীত ব্যক্তিবর্গ। নবাবদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। ব্রিটিশের গোড়া পল্টন নবাবকে গার্ড অব অনার প্রদান করতেন। এ মিছিলে তৎকালীন বিদেশীরাও অংশগ্রহণ করতো। এ উপলক্ষে রাস্তায় দেখা যেত নানা রকম খেলা দেখানে ওয়ালা।

ঢাকার নবাবরা তাদের সৌখিনতা প্রভাব প্রতিপত্তি ও ঈদের আনন্দকে অতি জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করার জন্য মিছিলের ব্যবস্থা করতেন। আনন্দের রঙে রঙীন আর ঝলমল হয়ে উঠত ঈদের রাজকীয় মিছিল। হাতির পিঠে জমকালো হাওদায় সওয়ার হতেন নবাবি দরবারের রাজপুরুষেরা। মিছিলে শুধু রাজ দরবারের লোকজন অংশ নিতেন। সাধারণ মানুষ সেখানে দর্শক। রাস্তায় দু'ধারের এবং দালানের ছাদে দাঁড়িয়ে লোকজন তাকিয়ে দেখত এই দৃশ্য। মৃদু মৃদু হাসিতে মানুষকে সম্ভাষণ জানাতেন নবাব।

নবাবের হাতির পিছনে অশ্বারোহীর দল চলত রাজকীয় ব্যাণ্ডের তালে। সুসজ্জিত আরবীয় ঘোড়াগুলো যেন পা থামিয়ে রাখতে চাইতো না। ঢাকার পথ পরিক্রম করার জন্য উৎসাহী তারা কেশর হেলিয়ে দুলিয়ে টগবগ করে চলত। মিছিলের শান শওকাত দেখে লোক মুগ্ধ হত। রাস্তার পাশে বিভিন্ন দালান কোঠার ছাদে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখত নরনারী। আতর গোলাপ আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়ত বাতাসে। মিছিল দেখতে আগত লোকজন ছড়িয়ে দিত মুঠো মুঠো গোলাপের পাপড়ি। হাতির পিঠে উপবিষ্ট নবাবের চারপাশে ঘিরে ছড়িয়ে পড়ত এগুলো। রাস্তার পাশে ভিক্ষুক হাত উঁচিয়ে ভিক্ষা চাইত। রাজপুরুষেরা পথে আশরাফী বিতরণ করতেন।

সুসজ্জিত হাতির দলের শোভাযাত্রা আরো আকর্ষণীয়। কালের প্রকোপে চিত্রকর্মের রঙ অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। ঢাকার আদি সাংস্কৃতিক জীবনের ছকটি এই চিত্রকর্মসিরিজ দেখে অনুমান করা যায়। এমন পুংখানুপুংখ দলিল আরও কোথাও পাওয়া যাবে? এগুলি মোগল শিল্পকলার সর্বশেষ নিদর্শন।

নিমতলী প্রাসাদের নবাব নুসরাত জং ছিলেন শিক্ষাগুরু নামজাদা প্রশাসক চারুকলা প্রিয় এবং লিপি বিশারদ। নিমতলী প্রাসাদে বসেই নবাব নুসরত জং ঢাকার সর্বপ্রথম ইতিহাস গ্রন্থ তাওয়ারিখে নুসরাত জং বা তারিখে ঢাকা, ফারসী ভাষায় রচনা করেছিলেন। তার দরবারের চিত্রশিল্পীদের কথা পূর্বেই উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছি। এগুলো মোগল যুগের চারুকলার শেষ নিদর্শন হিসাবে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। পাশ্চাত্য চিত্রকলারও ভক্ত ছিলেন নবাব নুসরাত জং। তার আরবী ও ফারসী হস্তলিপি (ক্যালিগ্রাফি) ছিল চমৎকার। প্রায়ই নিজের হাতে লিখে অপরকে শিক্ষা দিতেন। সম্ভবত তার আমলে ঢাকায় একটি চিত্রশালা গড়ে উঠেছিল। যা পরে আর্থিক সংকটের কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ঢাকা জেলার কালেক্টর ও খ্যাতিমান চিত্রকর চার্লস ড'য়লী আনুমানিক ১৮১৯ খৃঃ নবাব সাহেবের সাথে তার বাসভবনে সাক্ষাৎ করেছিলেন। নবাবের বয়স ছিল তখন ৬০ বছর ডয়লী তার গ্রন্থে জানিয়েছেন বাংলা অনূদিত তার কয়েকটি লাইন এই রকম বর্তমান নবাব নুসরাত জং পূর্বোক্ত নবাব জেসারাত খানের সাক্ষাৎ বংশধর। তার বয়স আনুমানিক ষাট বছর। বিনম্র ব্যবহার, মার্জিত রুচি ও হৃদয়ের মহানুভবতায় তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তদুপরি তার পরিশীলিত শিল্পরস জ্ঞানও অতীব প্রখর। প্রাচ্য স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত ও চমৎকারভাবে অলংকৃত ভবনে ঢাকাতেই তার বসবাস। সমগ্র দরবার কক্ষটি বৃটিশ চিত্রকলা ও প্রিন্টে এমনভাবে আকীর্ণ যে এক ইঞ্চি পরিমাণ দেওয়ালও দৃষ্টি গোচর নয়। সর্বদা আনুষ্ঠানিকভাবে বাহিরে গমনাগমনের সময় বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পার্শ্বচরবৃন্দ নুসরাত জং-এর অনুগামী হয়ে থাকেন।[৪১] নুসরাত জং এর বিবরণ থেকে জানা যায় নবাব নুসরাত জং তার ছোট ভাই শামসুদৌলাহ মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম মুবারকদৌল্লাহর কন্যা বদরুন নিসার সঙ্গে বিয়ে করান। এই বিয়েতে নবাব নুসরাত জং মুর্শিদাবাদে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে আনন্দ উৎসব করেন। শাদী মুবারক সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি দুলহা দুলহিনসহ ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। এই উপলক্ষে তিনি চকবাজারে শাহী বাদ্যভাণ্ড তুলিয়া নিয়া আপন প্রাসাদে স্থাপন করেন এবং স্বয়ং শাহী তাজ্জামে আরোহণ করিয়া বিরাট মিছিল সহকারে সারা শহর প্রদক্ষিণ করেন। এই বিবাহ উৎসবে তিনি আমীর গরীব সকলকেই বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন।[৪২]

নিমতলী নবাব প্রাসাদ

নিমতলী প্রাসাদের শেষ নবাব গাজীউদ্দীন হায়দার খুব আমোদ প্রমোদ, বিলাসে সব সময় মত্ত থাকতেন। তিনি অনেক ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যান। নবাব গাজীউদ্দীনের মৃত্যুর কিছুদিন পর কোম্পানী নিমতলী প্রাসাদের ভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এরপর কোম্পানী নিমতলীর অট্টালিকাসমূহ নিলামে তোলে। অধিকাংশ ক্রেতাই ভেঙে ফেলে দালানগুলি বাকি ছিল বারোদুয়ারী

www.pathagar.com

যেখানে স্থাপিত হয়েছিল ঢাকা জাদুঘর (বর্তমানে জাতীয় জাদুঘর)। নবাব গাজীউদ্দীনের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর পাওনা আদায়ের জন্য তার যাবতীয় সম্পত্তি যথা রাজকীয় হাওদাহ, আসবাবপত্র, শত শত পোষ্য পশু-পাখিসহ বিভিন্ন রকমের জিনিস নিলামে বিক্রি করা হয়। ঢাকার মদন মোহন বসাক পরিবার অনেক জিনিস ক্রয় করে নেয়। তাদের জন্মাষ্টমীর মিছিলে নায়েব নাজিমের জমকালো হাওদাটি ব্যবহার করা হত। ঢাকার অনেক ধনী পরিবার তাদের পারিবারিক অলংকারসমূহ ক্রয় করে নেয়। ঢাকার নিমতলী প্রাসাদের নবাবদের স্মৃতি ধরে আছে সেই পশ্চিম দিকের (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর পিছনে) ফটকটি। নায়েব নাজিম আমলে ফটকের বা দেউড়ীর উপর তলার নহবত খানায় প্রতি সন্ধ্যায় নহবত বাজিয়ে নওয়াবের সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করা হত। বর্তমানে ফটকটি ধ্বংসের পথে। এ ফটকটির প্রশংসা করেছিলেন পরিব্রাজক বিশপ হেবার।

বিশপহেবার ১৮২৪ সালে ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে আসেন। তখন তিনি অত্র এলাকায় বসবাসরত পূর্ববঙ্গের সর্ববৃহৎ জমিদার মীর আশ্রাফ আলীর সঙ্গে দেখার করার পর নিমতলীর বারোদুয়ারীতে তৎকালীন নবাবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বিশপ হেবার তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। বাংলা অনূদিত অংশটি এই রকম –

"দু'পাশে গাছ-গাছালি ভর্তি এক রাস্তা দিয়ে তারা এসে পৌঁছালেন পুরানো ইটের প্রাচীরে ঘেরা নিমতলী কুঠিতে। এক কোম্পানী সেপাই ছিল তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। এরা কোম্পানীর সেপাই। নবাবকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য এদের রাখা হয়েছে প্রাসাদে। সামনে আরেকটি সুন্দর ফটক খোলা গ্যালারীসহ সেখানে বসানো নহবত। এখানে ছিল নবাবের নিজস্ব রক্ষীরা যাদের পরনে ছিল অদ্ভুত পোশাক। রূপোর লাঠি হাতে কিছু মানুষের জটলা যারা তাদের নিয়ে গেল ভেতরের দিকে। বর্গাকার চত্বরের চারপাশে ছিমছাম চুনকাম করা কিছু ইটের রাড়ি। ডানদিকে এক সার সিঁড়ি উঠে গেছে সুন্দর এক হল ঘরের দিকে যার স্থাপত্য গথিক ধরনের। ঘরের ভেতর বড় গোলাকার এক টেবিল লাল কাপড়ে ঢাকা, মেহগনি কাঠের চেয়ার চমৎকার দুটি বড় বড় কনভেক্স আয়নাও সাধারন দুটি আয়না। দেয়ালে ঝুলছিল রাজার সম্রাট আলেকজাণ্ডার লর্ড ওয়েলেসলী এবং হেষ্টিংয়ের ছবির প্রিন্ট। আর ও ছিল চিনারীর আঁকা নবাব ও তার ভাইয়ের দুটি সুন্দর প্রতিকৃতি। ঘরের আসবাবপত্র সব রুচিসম্মত এবং অভিজাত লোক দেখানো জাঁকজমক তাতে ছিল না"।[৪৩]

www.pathagar.com

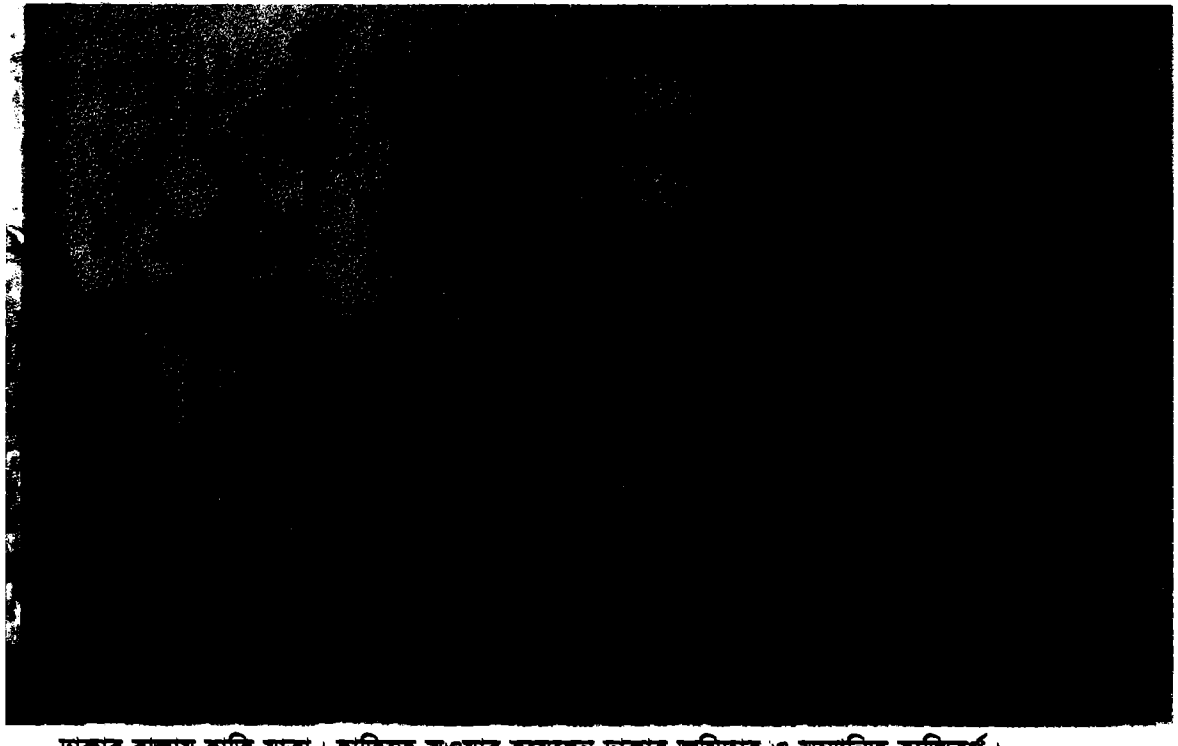

ঢাকার রাস্তায় হাতি যাত্রা। হাতিতে সওয়ার হয়েছেন ঢাকার জমিদার ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।

ছবি-সৌজন্যে : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর।

www.pathagar.com

নিমতলী নবাব প্রাসাদ থেকে অগ্রসরমান ঈদের মিছিল। হাতির পিঠে নবাব নুসরাত জং বাহাদুর।

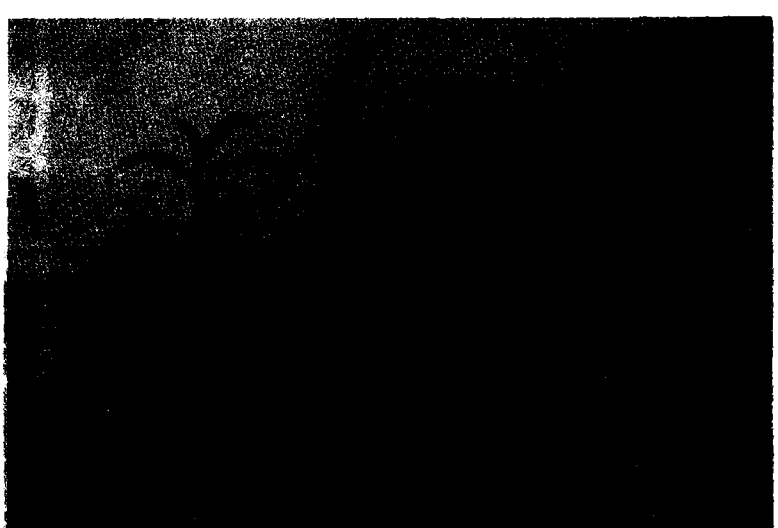

উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অশ্বারোহনে ঈদ মিছিলে অংশগ্রহণ।

ছবি-সৌজন্যে ঃ বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর।

www.pathagar.com

বেগম বাজারের কারতালাব খাঁ মসজিদের পাশ দিয়ে শহরের গণ্যমান্য কোন ব্যক্তির শিবিকা যাচ্ছে।

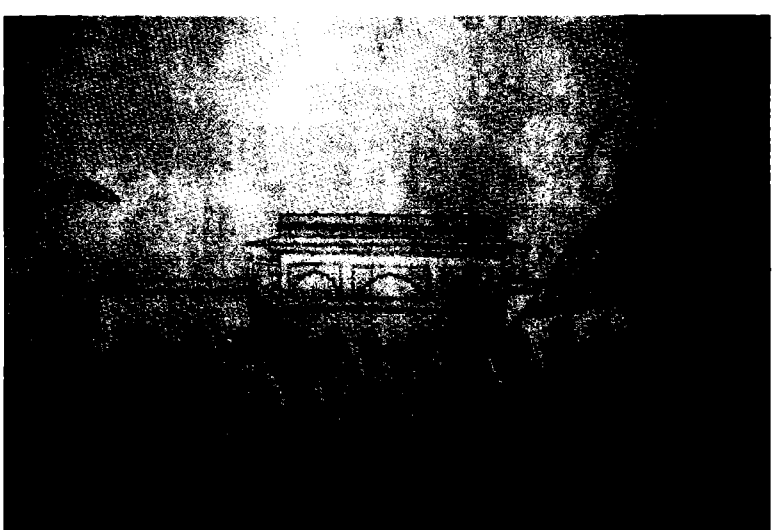

ঈদ মিছিলে বাদকদলের অনুগমন।

ছবি-সৌজন্যে ঃ বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর।

www.pathagar.com

ঈদ উপলক্ষে চকবাজারে জমায়েত মেলা। এই চিত্রে বিখ্যাত মীর জুমলার কামান দেখা যাচ্ছে।

ছবি-সৌজন্যে ঃ বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের শেষার্ধে ধানমন্ডির ঈদগার সামনে বসতো মেলা। নদী বইতো তখন এর পাশ দিয়ে। কাল্পনিক চিত্র এঁকেছেন শিল্পী আসেম আনসারী। ছবিটি ঢাকা নগর যাদুঘরে সংরক্ষিত।

www.pathagar.com

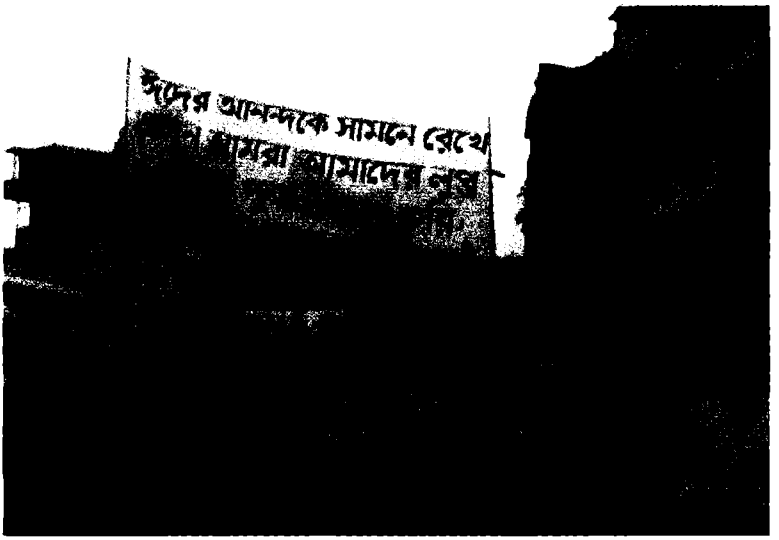

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রদর্শনী ও ব্যানারে লেখা।

ব্যানার বহন করে যুবকবৃন্দের অগ্রযাত্রা।

www.pathagar.com

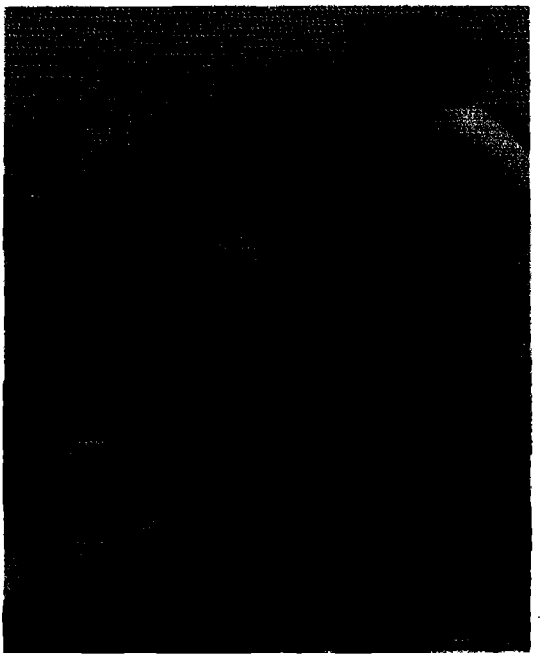

১৯৯৪ সালে ঈদ মিছিল উদ্বোধন করছেন মেয়র মোহাম্মদ হানিফ। পাশে দাঁড়ানো আহবায়ক নাজির হোসেন নাজির ও ঢাকার সাবেক মেয়র ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত।

মাজেদ সরদারের ব্যবহৃত গাড়ীর প্রদর্শনী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

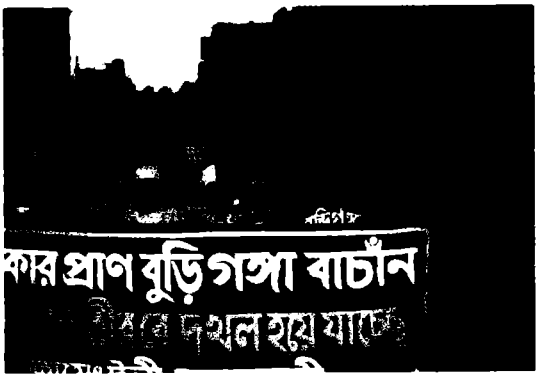

ঈদ মিছিলে বুড়িগঙ্গা বাঁচানোর দাবি।

ঈদ মিছিলে ঢাকার গ্যাস সমস্যা তুলে ধরা হয়।

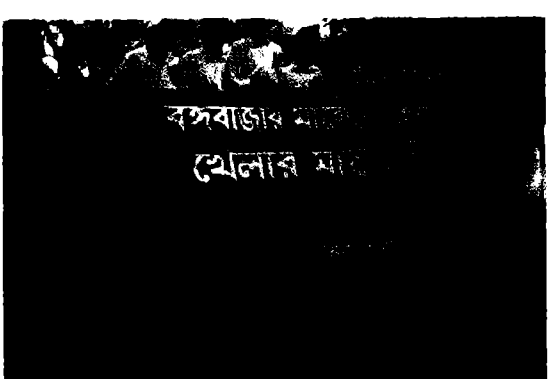

ঢাকার জনগণের দাবি।

www.pathagar.com

মাওলা বকশ সরদার মেমোরিয়াল ট্রাস্টের "ঢাকা কেন্দ্র" থেকে প্রকাশিত ঈদ কার্ড।
প্রচ্ছদে হাল আমলের ঈদ মিছিলের ছবি একেঁছেন শিল্পী ফরিদ আহম্মেদ। ছবি–১৯৯৬।

www.pathagar.com

ঢাকের চলমান মঞ্চে নবাব সেজে তিন ব্যক্তি। নবাব আবদুল গনি, নবাব আহসানউল্লাহ ও নবাব সলিমুল্লাহ।

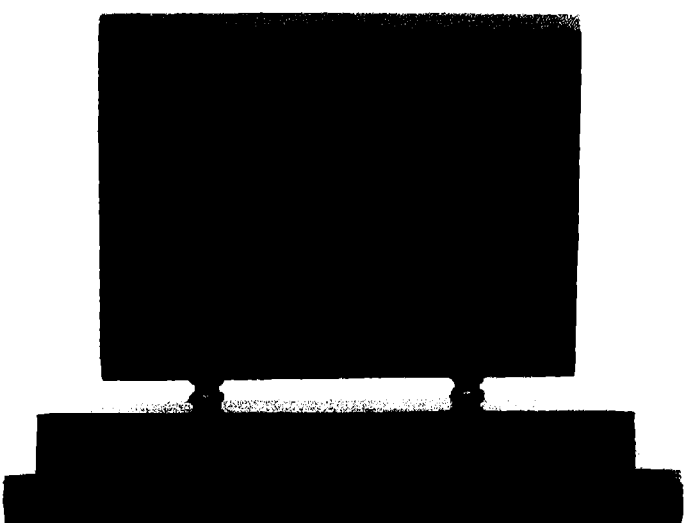

ঈদ মিছিলে বিজয়ীদের পুরস্কারের জন্য ক্রেস্ট।

www.pathagar.com

ঈদ মিছিলে ঢাকা সমিতির হাতি। নবাব ও সৈন্য সেজে যুবকবৃন্দ।
ছবি-১৯৯৮।

ঘোড়ার গাড়ি ও ব্যান্ড পার্টির বহর।

www.pathagar.com

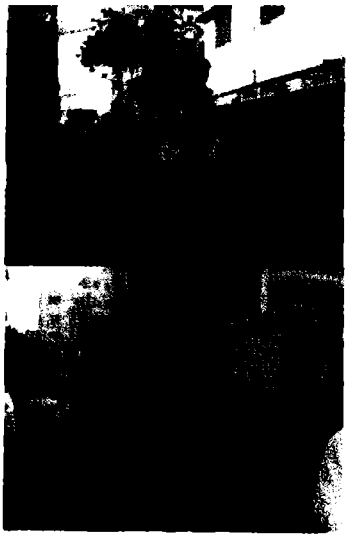

রমনা রেসকোর্সের প্রতিকী ঘোড়দৌড়ের দৃশ্য।

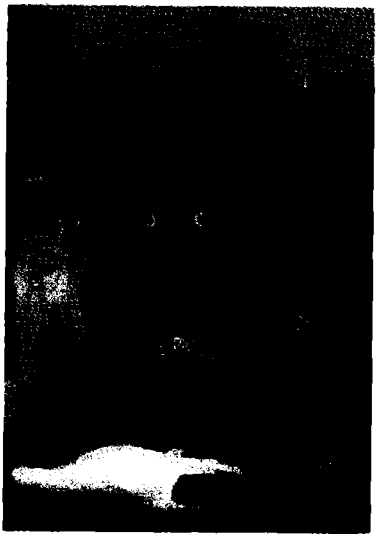

মশা সমস্যা।

১। ঈদ মিছিলে সং সেজে ঢং।
২। বাঈজী নৃত্য।

নবাব সেজে এম.পি হাজী সেলিম তনয়।

www.pathagar.com

ঈদ মিছিলে ঘোড়া গাড়ির শোভাযাত্রা। সরদার সেজে কয়েকজন।

সুরিটোলা সরকারী স্কুল প্রাঙ্গনে ঈদের মেলা।

www.pathagar.com

গরুর গাড়ীর চলমান মঞ্চে নবাব সলিমুল্লাহর প্রতিকী সালিশী দরবার। অপরাধীকে পেটে কাঁঠাল বেঁধে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। পাশে জল্লাদ দাঁড়িয়ে তাকে চাবুক পিটাচ্ছে। ছবি-১৯৯৬।

www.pathagar.com

নিমতলীতে নায়েব নাজিমদের বিশাল বাগান ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল এলাকায় যে পুকুরটি রয়েছে। এক সময় সেটি ঐ বাগানের মধ্যেই ছিল। এটিকে নবাবী দীঘি বলা হত।

বিশ্ববিদ্যালয় রমনা মাঠ হাইকোর্ট এলাকায় পুকুর ও বাগানের প্রভৃতির যে চিহ্ন। পাওয়া যায় সেগুলি নিমতলী প্রসাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই এলাকায় দৃষ্ট বিলুপ্ত প্রায়, সংকীর্ণ নালাসমূহ প্রাসাদের হাম্মাম খানার অংশ বিশেষ। কমলাপুর হতে এখানে পানি সরবরাহ করা হতো। নবাব গাজিউদ্দিন হায়দার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ইংরেজরা সবগুলো প্রাসাদ নিজের অধিকারে নিয়ে নিলামে বিক্রি করে দেয়। কয়েকবার হস্তান্তরিত হওয়ার পর ১৯১৩ সালে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিমতলী প্রাসাদসহ সমগ্র প্রাসাদটি দখলে নেন।

উনিশ শতকে নবাবী দালান নামে গোটা এলাকাটি পরিচিত ছিল। এখানে ছিল কারুকার্য খচিত বিশাল বেশ কয়েটি অট্টালিকা। এগুলো নায়েব নাজিমদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গের জন্য নির্মিত হয়েছিল। সে যুগে দালানকে বলা হত কাটারা যেহেতু নবাব ও নবাব বংশের জন্য কাটারা নির্মিত হয়েছিল। সেজন্য উক্ত মহল্লাটিকে নবাব কাটারা বলা হয়ে থাকে। মোগল আমল থেকেই এটি ছিল ঢাকার অভিজাত এলাকা।

আজ ঢাকার নায়েব নাজিমরা আর নেই। তাদের সেসব কীর্তি এখন ইতিহাসের পাতায় ও জাদুঘরে স্মৃতি হয়ে আছে। তাদের সে উল্লাস মুখর ঝলমলে মিছিল এখন আর হয় না।

এ ধরনের মিছিলের আয়োজন করতে প্রচুর অর্থের দরকার হয়। ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ ধরনের মিছিল আয়োজন করা খুব কঠিন কাজ। নায়েব নাজিমরা ঈদের মিছিল খুব জাঁকজমকের সাথে আয়োজন করে ঢাকার এই প্রাচীন অনবদ্য কৃষ্টিকে লালন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

মোগল সূত্রীয় নবাবী সমাপ্তির পরবর্তী সময়গুলিতে ঢাকার আহসান মঞ্জিলের নবাবগণ জাঁকজমকসহকারে ঈদ আনন্দ উৎসব করতেন। এ কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

www.pathagar.com

ঈদ মিছিলে হাওদায় বসে অভিবাদনরত নবাব নুসরাত জং বাহাদুর। নায়েব নাজিম (১৭৯৬-১৮২৩) খ্রিষ্টাব্দ। জাহাঙ্গীরনগর, ঢাকা।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ঈদ মিছিল ঃ ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল

ঢাকার ঈদের মিছিল তৎকালীন প্রেক্ষাপটে কিছুটা দুর্বল আকার ধারণ করলেও ঢাকাইয়ারা সেই ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে দেয়নি। মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরম্ভ হয়েছিল। সে সময় থেকে ঈদ ঢাকা তথা বাংলাদেশে আরও বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। তখন থেকেই ঢাকার নেতৃবৃন্দ ঈদ মিছিলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল এই মিছিলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অতীতের মিছিল ছিল রাজ-রাজরার ব্যাপার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান মুহাম্মদ সিদ্দীক খান ঈদ মিছিল সম্পর্কে জানিয়েছেন- "The Eid procession of Dacca. Which has been revived in its pristine glory Since the achievement of pakistan, also used to be a great day. This procession Continued unitl after the turbulent years of the 1920's when due to the fury of communal passions it had to be abandoned".[৪৪]

অর্থাৎ ঢাকার ঈদ মিছিল পুনরায় পূর্ব গৌরব নিয়ে পুরুজ্জীবিত হয়েছে। যেহেতু পাকিস্তানের অর্জন একটি মহান দিবস হিসেবে পরিগণিত। এই মিছিল ১৯২০ সালের দুর্যোগ পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হিসাবে চালু ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হাঙ্গামায়, উপ্তত্ত পরিস্থিতির জন্য পরিত্যক্ত হয়ে গেল।

ঢাকায় জাঁকজমক সহকারে মহররম ও জন্মাষ্টমীর মিছিল বের হত। হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্মাষ্টমীর মিছিল এত জাঁকজমকসহকারে বের হত যে, সারা

www.pathagar.com

ভারতে এর জুড়ি ছিল না। পূর্বে উল্লেখ করেছি জন্মাষ্টমীর মিছিল মোগল রাজকীয় শোভাযাত্রার অনুকরণে সাজানো হত। ঈদের মিছিলটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের ব্যাপার অথবা ঈদের মিছিলটা ছিল আনন্দের সমারোহে ভরপুর, এই মিছিলের উদ্দেশ্য ছিল অনেক কিছু যেমন সবার জন্য আনন্দ মহল্লা ও আন্তঃ মহল্লার সঙ্গে সরাসরি সবার সম্পৃক্ততা, ধর্মের দিক দিয়ে চিন্তাধারার ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে সবার মাঝে একটা অনুভূতি জাগানো যে আমরা ঢাকাকে ও এর সংস্কৃতিকে সম্মান করি ও ভালোবাসি আর এর প্রতীক হিসাবে এই মিছিলটা অনুভূতির একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

ঈদ মিছিল ঢাকার নিজস্ব সম্পদ কারণ ঢাকার বাইরে থেকে শহরে আসা সবাই ঈদের ছুটিতে বাড়ি চলে যায়। একমাত্র ঢাকাইয়ারা মিছিল করে আনন্দে অবগাহন করে। মহল্লায় মহল্লায় নতুন চমকপ্রদ আইটেম উপহার দেয়ার গোপনে নীরব প্রতিযোগিতা প্রতিটি অংশগ্রহণকারী মহল্লার আবালবৃদ্ধবনিতারা বিশেষ করে মহল্লার চালিকা শক্তি যুব সম্প্রদায়, পৃষ্ঠপোষক, মহল্লার মুরব্বী ও সরদারগণ এই বিশেষ দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।

মিছিলে কে কোথায় অবস্থান নেবে সে বিষয়ে লটারীর মাধ্যমে ও গত বৎসরের প্রদশনী চমৎকারিত্বের উপর নির্ভর করে স্থির হতো। ঈদের মিছিল ছিল ঢাকাবাসীর ঐক্য ও মুসলিম জাগরণের প্রতীক। ঈদুল ফিতরের পর দিন বিকালে এ মিছিল বের হত। বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আন্তর্জাতিক নাট্য ব্যক্তিত্ব জনাব সাঈদ আহমেদ ২৫ শে অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে লণ্ডন বিবিসি রেডিওতে ঢাকার সংস্কৃতি বিষয়ক এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। ঈদ মিছিল সম্পর্কে তিনি বলেন, মিছিল ফান ফেয়ার প্রত্যেক সোসাইটিতে একটি খুব ইমপোটেন্ট আউটলেট এবং সেদিক দিয়ে ধরেন মুসলমানরা এখানে ঈদের মিছিল করতো, বিরাট মিছিল করতো।[৪৫]

তৎকালীন ঈদ মিছিলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং মুসলিম দেশগুলির ঘটনা ক্যারিক্যাচারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা।

ঈদের মিছিলে ঢাকার প্রায় সকল মহল্লা হতে মুসলিম বিশ্বের এবং নগর জীবনের ঐতিহ্য ও সমস্যার চিত্রগুলো তুলে ধরে তাদের দুঃখ সহানুভূতি প্রকাশ করা হত।

ব্রিটিশ আমলের শেষ অধ্যায়ে এসে মিছিলটি একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। কবি ব'নজীর আহমদ তিনি নিজে এ মিছিলে অংশ নিয়েছেন, তার দেয়া এক তথ্যে জানা যায়, মিছিলের উদ্যোক্তা ছিলেন হাকীম আরশাদ, কবি

www.pathagar.com

জাকারিয়া এবং জুম্মন বেপারী। তারা ঈদের পরের দিনের আনন্দ নিয়ে ভাবার পর শেফাউলমূলক হাকিম হাবিবুর রহমানের সাথে পরামর্শ করেন। হাকিম সাহেব তাদের কথা শুনে তাদের অনুপ্রেরণা দেন এবং জুম্মন ব্যাপারীকে বলেন, সৈয়দ আশরাফ হোসেনকে নিয়ে কমিটি করার জন্য। কয়েকদিনের মধ্যেই জুম্মন বেপারী সৈয়দ আশরাফ হোসেনকে নিয়ে কমিটি করে ফেললেন।

উপদেষ্টা পরিষদে ছিলেন, হাকীম হাবিবুর রহমান, ডঃ আন্দালীব শাদানী, কবি কায়কোবাদ, সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর, খান বাহাদুর মৌলভী আবুল হাসনাত ওরফে শাহজাদা মিয়া, রেজাউল করিম, নাদের বকশ ওরফে নাদের সরদার, আফিরুদ্দিন সরদার, সাকী সরদার, গনি সরদার, খলিল সরদার, মাওলা বকশ সরদার, মতি সরদার, বেলাল সরদার, ঢাকার বিখ্যাত কাদের সরদার এবং উর্দু ও ফারসী কবি শরফুদ্দীন আল হোসাইনী।

ঢাকার মোমিন মোটর কোম্পানীর মালিক আবদুল আজিজ ওরফে লাজিজ, তাকে এ কমিটির সভাপতি করা হয়েছিল। বাইশ পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি আহসান মোহাম্মদ নবী ওরফে জুম্মন বেপারী মিছিল কমিটির সেক্রেটারি।[৪৬]

ঈদ মিছিলের পুনরায় প্রচলন হয় বৃট্রিশ আমলের শেষ অধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে। শহরের এ সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাড়াও তখনকার আহসান মঞ্জিলের নবাব পরিবার অর্থ ও সাহস দিয়ে ঈদ মিছিলে সহযোগিতা করতেন। নবাব বাড়ির খাজা শাহাবুদ্দীন ও খাজা ইসমাইল সাহেবও মিছিলে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। জুম্মন বেপারী, কাদের সরদার, আবদুল আজিজ মিছিলের অগ্রভাগে কোন কোন বছর থাকতেন। নবাব হাবিবুল্লাহ ঢাকায় থাকলে তিনিও মিছিলকারীদের উৎসাহিত করতেন। মিছিলে থাকত কাশিদা পার্টির দলসমূহ। ঈদ মিছিলের তখনকার দিনে আকর্ষণ ছিল, মোটর গাড়ি। সেগুলি ছিল তখন নতুন। মোমিন মটর কোম্পানীর বাস ও ট্রাকগুলোকে ময়ূর, প্লেন, নৌকা, জাহাজ, বিভিন্নভাবে সাজিয়ে বের করা হত। হাকীম হাবিবুর রহমান বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তার শৈশবে দেখা ঈদ মিছিলের বিবরণ দিয়েছেন এভাবেঃ

"ঈদের দ্বিতীয় দিন এই মিছিল বের করা হতো। প্রথমত এই প্রশেসান (মিছিল) সাদাসিধেভাবে বের করা হতো। কিন্তু বর্তমানে রোজার সেহরীতে জাগানোওয়ালারাও অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। এইভাবে এই প্রশেসান বর্তমানে জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে গেছে। যার বড় বড় সদস্য শহরের বাস এবং মটর গাড়ির মালিক। এই মিছিল চকবাজার থেকে শুরু হয়ে ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী,

www.pathagar.com

নবাবপুর, বংশাল হয়ে পুনরায় চকে এসে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এই মিছিলের গানও সবই উর্দুতে গাওয়া হতো এবং সম্পূর্ণত মুসলমানরাই এতে অংশ নিত"।[৪৭]

মিছিল কমিটির সভাপতি আবদুল আজিজ। তিনি তার কোম্পানির বাস, ট্রাক ও কাশিদা পার্টির ব্যবস্থা করতেন। তার গাড়িগুলোর মধ্যে আনসার, ফেমাস, মেহেরবান নাম ছাড়াও আর কিছুসংখ্যক গাড়ি ছিল। তৎকালীন এদেশের বৃটিশ শাসক তার কয়েকটি গাড়ি ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিয়েছিল।[৪৮]

ছবি সৈয়দ ফজলে হোসেন।

www.pathagar.com

ঈদ মিছিলে ব্যান্ড পার্টি ও ঘোড়ার গাড়ি।

ঈদ মিছিল চলার রাস্তা

মিছিল চকবাজার মসজিদের পাশে মোমিন কোং অফিসের কাছ থেকে আরম্ভ হয়ে চকমোগলটুলী, ইমামগঞ্জ, মিটফোর্ড, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী হয়ে সদরঘাট, ভিক্টোরিয়া পার্ক, রায়সাহেব বাজার, নবাবপুর, বংশাল, আবুল হাসনাত রোড, জেল রোড হয়ে পুনরায় চকবাজার এসে শেষ হত।

কোন কোন বছর এর ব্যতিক্রম হত। মিছিল চকবাজার থেকে উর্দু রোড, হরনাথ ঘোষ রোড হয়ে (মোমিন কোং বাড়ি রাহমান মঞ্জিলের কাছ দিয়ে) পোস্তা, ওয়াটার ওয়াকর্স রোড, বংশীবাজার, ইমামগঞ্জ, মিটফোর্ড, বাবুবাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, সদরঘাট, জনসন রোড, ভিক্টোরিয়া পার্ক, রায়সাহেব বাজার, নবাবপুর, বংশাল রোড, মাহুতটুলী, আবুল হাসনাত রোড, জেল রোড হয়ে মিছিল চকবাজার মোমিন মটর কোম্পানির অফিসের কাছে এসে শেষ হত এবং এখান থেকেই পুরস্কার বিতরণের কাজ সমাধা করা হত বলে জানা যায়।

ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সরদারগণ চারটি স্পটে যেমন আহসান মঞ্জিলের প্রধান ফটক, (নহবতখানা) রায়সাহেব বাজারের পুল, বংশাল, তিনকোনাপার্ক এবং মহৎটুলী এলাকায় দাঁড়িয়ে মিছিলকারীদের উৎসাহিত করে

www.pathagar.com

চা নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার এ, ই আর খান সাহেবের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, রায় সাহেব বাজারের কোর্টের কাছে পুলের উপর লোকজন মিছিল দেখার জন্য জমায়েত হতেন। এখানে ইলিয়াস সরদার উপস্থিত থেকে মিছিলকারীদের উৎসাহিত করতেন। আহসান মঞ্জিলের প্রধান ফটকের, (নহবতখানার) উপর নবাব পরিবারের মহিলারা দাঁড়িয়ে কাপড়ের পর্দার আড়াল থেকে মিছিল দেখতেন। ফটকের কাছে নবাব বাড়ির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকতেন।

ঈদের মিছিলকে কেন্দ্র করে একটি আত্মীয়তার বন্ধন নির্মিত হত। এ আত্মীয়তা শুধুমাত্র আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আত্মীয়তা নয়, এ আত্মীয়তা হচ্ছে সকলের মধ্যে আত্মীয়তা। মহিলারা বিভিন্ন মহল্লা থেকে আসতেন মিছিল দেখার জন্য। ছাদের উপর কাপড় দিয়ে পর্দা ঘেরাও করে দেওয়া হত। যাতে বেপর্দা না হন। পর্দার আড়াল থেকে তারা মিছিল দেখতেন।

বিভিন্ন এলাকার যুব সম্প্রদায় শরবতের গাড়ি নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করত এবং মিছিল চলকালীন সময়ে মিছিলকারীদের শরবত পান করনো হত। এ. শরবত নিয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। ভাল শরবত পানাহারকারীকে পুরস্কৃত করা হত।

এ মিছিলে একাধিক হাতি সুন্দর সাজে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। সুশোভিত হাতি মিছিলের সৌন্দর্য ও জৌলুস বৃদ্ধি করত। হাতিগুলিকে সুন্দর সাজে সাজিয়ে রাজপথের উপর দিয়ে সারি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হত। হাতির সংখ্যা যে বছর কম দেখা যেত, সে বছর ট্রাক দেখা যেত বেশি। হাতি ঢাকার বর্মী জমিদার বাড়ি, নেত্রকোণা জমিদার বাড়ি থেকে আনা হত।

ব'নজীর আহমেদের বিবরণ থেকে জানা যায়, এ মিছিলে উন্নতমানের কয়েকটি রেসের ঘোড়া সুন্দর সাজে সাজিয়ে আনা হত। মিছিল চলাকালীন সময়ে এ ঘোড়াগুলো বাদ্যের তালে তালে ছন্দে ছন্দে এগিয়ে যেতো আর বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নাচ দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতো।

কাল রংয়ের একটি ঘোড়ার নাম ছিল খোশনসীব। পাগলাটে ধরনের বেশ কয়েকবার রেসের বাজি জিতেছিল। অস্থির স্বভাবের গাঢ় খায়রি রংয়ের আরেকটি ঘোড়ার নাম ছিল মাইমাস্কট। সাদা রংয়ের মেহেরনেগার নামের একটি ছিল চটপটে। বন্য হরিণীর মত চালচলন। চোখে মুখে সব সময় চঞ্চল ভাব দেখা যেত। শান্ত স্বভাবের এবং প্রভু ভক্ত লাল রংয়ের একটি ঘোড়ার নাম ছিল ডাক লিজন।[৪৯]

www.pathagar.com

এ মিছিলে কয়েকটি ঘোড়া যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে নিয়ে আসা হত। রহমতগঞ্জ এলাকার যুবক সম্প্রদায় একবার বখতিয়ার খলজীর ও তার সপ্তদশ অশ্বারোহীর বহুবিজয়ের চমৎকার চিত্র মিছিলে দেখিয়েছিল। এ ছাড়াও থাকত গরুগাড়ি ও ঘোড়াগাড়ির বহর। উর্দু রোডের মির্জা মান্নার দেউরি নিবাসী ইসমাইল সরদার যিনি দুলু সরদার নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ঈদ মিছিলের জন্য একটি গান লিখেছিলেন। উর্দু রোডের হিন্দু মন্দিরের কাছে থাকত হিন্দু ধোপারা। তারা ঈদের মিছিলে বিচিত্র সাজে সংসেজে বাদ্যের তালে নেচে নেচে এই গান গাইতঃ

আও আও মিলকে চালে হিন্দু মুসলমান
দুনো হাম হায় পাড়োশী, ঝগড়া কাহেকা
আও আও মিলকে চালে হিন্দু মুসলমান

মিছিলে দৈত্য রাজা সেজে অভিনয় করতেন। রহমতগঞ্জের প্রবাদ পুরুষ এককালে ঢাকার বিশিষ্ট কুস্তিগীর কেয়ামুদ্দিন। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে যখন উচ্চারণ করতেন–

লাগেংগে তোপকে গোলে
জাপানকি টকিও পর
সদাসর বুলন্দি মে।

তার কণ্ঠে এ কথা গম্ভীর শোনাতো বলে দর্শকরা সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে দূরে সরে যেতেন। ব'নজীর আহমদ জানান, মিছিলের প্রথম বছর হাকীম আরশাদ একটি গান লিখেছিলেন লম্বা মিছিলের এক তৃতীয়াংশের শোকের পোশাকে অর্থাৎ কালো কাপড়ের তৈরি বিশেষ ধরনের ইসলামী পোশাকে সজ্জিত দশ বার জন যুবক হৃদয়গ্রাহী সুরে গানটি উচ্চস্বরে গেয়েছিলেন-

পাঞ্জাবকে আন্দার জালিয়ানওয়ালা বাগমে
কেতনে বাচ্চে কো-তুনে এতিম বানায়ো রে
কেতনে আওরাত কো-তুনে বেওয়া বানায়ারে
বেকসুর গোলি চালায়ারে
হায় হায় তুনে বেকসুর গোলি চালায়ারে,

এ গানটি গাওয়ার পর মিছিল শেষে সরকারের নির্দেশে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিচারে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কয়েক মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।[৫০]

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশদের বিরোধিতার জন্য ব্রিটিশ সৈন্য বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি বর্ষণ করলে ৩৭৯ জন নিহত এবং এক হাজার দু'শ' লোক আহত হয়। উক্ত গানটি এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

ঢাকার মুসলমানেরা ইংরেজদের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কথা ঈদ মিছিলে তুলে ধরে একটি মানবিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল।

কলকাতার হিন্দুদের জেলেপাড়ার সঙের মিছিলে উক্ত ঘটনা দেখানো হয়েছিল। মিছিলে সঙ সেজে ছড়া গান গেয়ে ক্যারিকাচারের মাধ্যমে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছিল। তৎকালীন ইংরেজ সরকার সঙের মিছিলে গান ও ছড়া এবং রাজনৈতিক আন্দোলমূলক বলে সন্দেহের চোখে দেখতেন। জেলেপাড়ার সঙ হাসির গান গেয়ে যেমন সকলকে প্রচুর আনন্দ দিত ঠিক তেমনি সমাজের অনাচার ও দুর্নীতির ওপর কশাঘাত করে দায়িত্বশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সমাজ চেতনামূলক গান ও ছড়াগুলি এদিক দিয়ে নৈতিক শিক্ষার মূল্যবান বলেস্বীকৃত হয়েছিল।[৫১]

ঈদের মিছিলের গানগুলি বেশির ভাগই উর্দু ভাষায় গাওয়া হত। হাকীম আরশাদ ঈদের মিছিলের জন্য কয়েকটি বিপ্লবী গান লিখেছিলেন। রোজার মাসে যারা কাশিদা গেয়ে রোজাদারকে জাগাতেন সে কাশিদা গায়কদের ঈদ মিছিলের দিন পুরস্কৃত করা হত। কোনো কোনো বছর এর ব্যতিক্রম হত। ২৭শে রমজান রাত্রিতে কাশিদা গায়কদের পুরস্কার বিতরণ করা হত। প্রায় সব মহল্লা পঞ্চায়েতে কাশিদা গায়কদের দল থাকত। কবি খালিস, সু-শিক্ষিত পীর ও হাফেজ জহরুল হক মোবারকী এবং হাকীম আরশাদ, হোসেনী দালানের আবুল কাসেম জান সাহেবও কাশিদা লিখতেন-

সু-শিক্ষিত পীর ও হাফেজ জহুরুল হক মোবারকী এর গজল ও কাশিদা হৃদয়স্পর্শী। আধ্যাত্মিক প্রবণতাই উনার কাব্যে বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

পুরস্কার বিতরণ

আয় মাহে যী কারাম
ঢা রাহা হায় সিতাম, তেরা জানা
হায় গুজরা খুশী কা জামানা

কবি খালিস রচিত এই কাশিদাটি তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং এটি গেয়ে গায়করা বেশ কয়েক বছর প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঈদ মিছিলে বেশির ভাগই হোসেনী দালান নিবাসীরা প্রথম পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করতেন। বেচারাম দেউরী, নবাবগঞ্জ মহল্লা, একেক বার একেক মহল্লা প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। ১৯৪৭ এর পর পাকিস্তানের সময় উর্দূ রোডের একটি দল বেশ কয়েক বছর প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল।

www.pathagar.com

হায় হায়
ঈদের কাপড় পাই নাই
হায় হায়
ঈদের সেমাই খাই নাই
হায় হায়

এই সাড়া জাগানো শ্লোগানটি নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল খাজা দেওয়ান নিবাসী চকবাজারের তৎকালীন সুস্বাদু পোলাও বিক্রেতা লাল মিয়া। সে অনেক টোকাই ও ভিখারী বাচ্চাদের সাথে নিয়ে মিছিলে বেশ কয়েক বছর অংশগ্রহণ করেছিল এবং ঢাকার ঈদ মিছিলের শেষ বছর সেই প্রথম পুরস্কার হিসাবে একটি বড় আকারের কাপ পেয়েছিল। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। বাংলাদেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রতিদিন গ্রামগঞ্জ থেকে লোক খাদ্যের আশায়, সাহায্যের আর কর্মের আশায় ঢাকায় এসে ভিড় জমাতে থাকে। অনাহার ও মহামারীতে অনেক লোক মারা যায়। সে তৎকালীন দুর্ভিক্ষের এই ঘটনা মিছিলে দেখিয়েছিল। মিছিলে প্রথম পুরস্কার হিসাবে একটি বড় আকারের কাপ, দ্বিতীয় পুরস্কার একটি সীল, আর তৃতীয় পুরস্কার মেডেল দেয়া হত। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঢাকা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকতেন। মাহুতটুলীর সামাদ সরদার ঈদ মিছিলে কোনো কোনো বছর কাপ প্রদান করতেন বলে জানা যায়। পরের বছর মিছিল করার জন্য যে সমস্ত দলকে দায়িত্ব দেয়া হত তাদের সে বছরই দায়িত্বের প্রতীক হিসাবে নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ বাহাদুরের দরবারে পাগড়ি পরিয়ে দেয়া হত। মিছিলে কোন্ মহল্লা আগে বা পিছনে থাকবে কমিটি তা লটারীর মাধ্যমে সিরিয়াল নম্বর প্রদান করত।

সাধারণত তিরিশ বা চল্লিশের দশকের নানা রকম উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ট্রাকের ওপর সুন্দর মঞ্চ বানানো হত এবং তরুণ সম্প্রদায় বিচিত্র ধরনের পোশাক- পরিচ্ছদ পরে অভিনয়ের মাধ্যমে একেকটি ঘটনা তুলে ধরত। সামাজিক এবং ঢাকার নগর জীবনের সমস্যা নিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন ধরনের সঙ সাজিয়ে গরুর গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হত। বিভিন্ন মহল্লা থেকে আগত সঙয়ের দল গান বাজনা ও হাস্যকৌতুক করে মানুষকে আনন্দ দিত। নাটকীয় ভাব প্রকাশের সর্বোউৎকৃষ্ট ও সার্বজনীন মাধ্যম হল সঙ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা উৎসবের সময় সঙ আত্মপ্রকাশ করত। মুখ্যত মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ সৃষ্টি হয়েছিল। ঈদের মিছিল হল সমাজের দর্পণ তাই সঙয়ের মুখ দিয়ে নানা ভুল ভ্রান্তির ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কথা বলানো হত। দশের সামনে দেখানো হত বিভিন্ন সামাজিক চিত্র। ঢাকার লালচাঁদ গোয়ালার মিছিল এবং জন্মাষ্টমীর মিছিলেও সঙয়ের বিভিন্ন রকম প্রদর্শনী দেখানো হত।

www.pathagar.com

ঈদের মিছিলে অনেকে বিভিন্ন রকম মুখোশ পরে অংশগ্রহণ করত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুখোশ পরে নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের প্রচলন রয়েছে। জাপানের লোক সংস্কৃতিতে মুখোশ নৃত্য একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অনেকে মুখোশের পরিবর্তে মুখে রংমেখে বিচিত্র সাজে সেজে মিছিলে অংশ নিত।

ঈদ মিছিলের আগেও পিছনে থাকত ব্যাণ্ড পার্টির বহর। জনাব এ, ই আর খান সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তিনি ১৯৪৭ সালের পর হতে পাকিস্তান আমলে ড্রাম বাদকের দল নিয়ে ঈদ মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। বড় ড্রামটি তিনি বাজাতেন। নারিন্দা এলাকার একটি ক্লাবও ড্রাম বাদকের দল নিয়ে আসত।

ঈদ মিছিলে অংশগ্রহণকারী বকশীবাজারের জনাব ইয়াসিন সাহেব সাক্ষাৎকারে জানান, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় যেমন কেউ নামাজ পড়ছে, কেউ মোনাজাত এ ধরনের ঘটনা দেখানো হত। রোজা না রেখে পর্দার আড়ালে হোটেলে লুকিয়ে খাওয়া, মসজিদের দৃশ্য, ঈদের চাঁদ দেখে মোনাজাত, এবং একজন লোককে মদখোর সাজিয়ে জুতার মালা পরিয়ে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, মঞ্চে লেখা থাকত মদখোরের শাস্তি। এ ধরনের ঘটনা ট্রাক বা গরুর গাড়ির চলমান মঞ্চে তুলে ধরা হত। সুরিটোলা "জিন্নাহ ক্লাব' একবার বাঁশের কঞ্চি, কাগজ ও কাপড় দিয়ে কৃত্রিম তাজমহল তৈরি করে ঠেলাগাড়ির চলমান মঞ্চে প্রদর্শন করেছিল। তখনকার দিনে আগুন নিভানোর দল এ আর পি বা এয়ার রেড পিকেসাস ঈদ মিছিলে তাদের আগুন নিভানোর কলাকৌশল জনসচেতনতার জন্য প্রদর্শন করত।

ঢাকায় তখন অনেক মহল্লায় ডনখানা খোলা ছিল। শরীর চর্চা কেন্দ্রকে তখন ডনখানা বলা হত। ব্যায়ামবীর ও কুস্তিগীররা ঈদের মিছিলে তাদের নিজ নিজ নৈপুণ্য দেখাতেন। বর্তমানে ঢাকায় শরীর চর্চা কেন্দ্র আগের মত নেই। ফলে একটি ঐতিহ্যবাহী চর্চা ধ্বংস হল না বরং শহরের স্বাস্থ্য আর বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচবার প্রতিরোধ শক্তিও অনেকটা বিলুপ্ত হল।

একটি মর্মান্তিক ঘটনা

একটি মর্মান্তিক ঘটনা যা তখনকার ঈদ মিছিলের দুঃসংবাদ বয়ে আনে ভারত বিভাগের পূর্বে পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখনকার একটি ঈদের মিছিল যখন নবাবপুর রোডের ভিতর প্রবেশ করে, তখন নবাবপুরের রাস্তায় দু'দিকের হিন্দু ভবনগুলো থেকে ইষ্টক বৃষ্টি, পাটা-পুতা, চৌকি, বাড়ির ভারী আসবাবপত্র মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের উপর বর্ষিত হওয়ার ফলে বহু মুসলমান যুব বৃদ্ধা আহত হয়েছিল। সে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। নবাবপুরে তখন প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিলো।[৫২]

www.pathagar.com

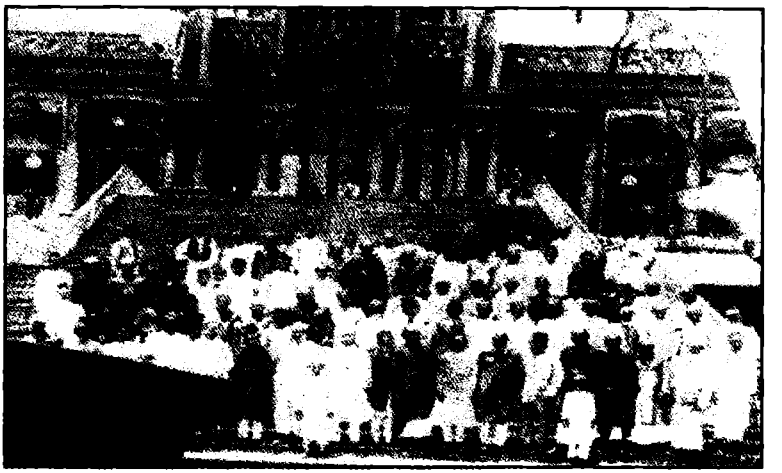

ঈদের দিনে আত্মীয়স্বজনের সাথে নবাব সলিমুল্লাহ।

বঙ্গভবনের ফটকের কাছে ঢাকাইয়াদের ঈদ আনন্দ মিছিল। প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী তা উদ্বোধন করেন। ছবি-২০০১।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম জানিয়েছেন-১৯৪৬ এর ঈদের মিছিল নবাবপুর দিয়ে যাবার সময় চারিদিক থেকে আক্রান্ত হয় এবং বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। এ সময় পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে, সম্ভবত ঢাকায় মিছিলের উপর এই প্রথম কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্বরূপ এক ঈদের মিছিলে শাঁখারী বাজারের যুব সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেছিল।[৫৩] প্রথমত ঈদের মিছিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অব্যাহত ছিলো। নাজির হোসেনের বর্ণনায় এর সমর্থন জানা যায়। সর্বশেষে বিমলানন্দ দাশগুপ্ত বাবু ছিলেন একজন কংগ্রেসী। তিনি পৌরসভার চেয়্যারম্যান থাকা কালেও কংগ্রেসের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ঢাকায় যে ঈদের মিছিল হত তার পুরোভাগ থাকতেন তিনি।[৫৪]

এ ছাড়া ডঃ মোহিনীবাবু বা চান্সি ডাক্তার ঢাকার কমিশনার লারকিন হোমিও ডাক্তার চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে ঈদের মিছিলে দেখা যেত বলে জনাব এ, ই আর খান সাক্ষাৎ কারে জানিয়েছেন। ঢাকার ঈদ ও জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের দুটি মিছিল বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়েছে। জন্মাষ্টমীর মিছিল ঢোলবাদ্যসহযোগে নামাজের সময় মসজিদের কাছ দিয়ে যাওয়ার জন্য, আবার কখনো হোলি খেলার দিন গায়ে রঙ দেওয়া নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। জেমস ওয়াইজ এর দেয়া তথ্যে জানা যায়, হিন্দু জমিদাররা যেমন মহররম পালনে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। মুসলমান জমিদাররাও তেমনি অর্থ সাহায্যে করেন দুর্গা পূজায়।[৫৫]

অন্তত উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালী কখনো ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ধর্মীয় উৎসব শুধু ধর্মীয় উৎসবে সীমাবদ্ধ ছিল না। এক ধরনের আনন্দোৎসব বা মিলনোৎসব ছিল। ঢাকায় একশত বছর পূর্বেও হিন্দু মুসলমানদের মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এখনও আছে।

১৯০৬ সালে ব্রাডলি বার্ট ঢাকা বিষয়ক তার গ্রন্থে লিখেছেন-মুসলমানদের দ্বারা পূর্ব বাংলা বিজিত হওয়ার পর থেকে মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদের পূজাপার্বণে বা ধর্ম বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ বা ধর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নাই। হিন্দুদের মন্দির মুসলমানদের মসজিদের পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই। পূর্ব বাংলার দীর্ঘদিনের ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাসে ব্যাপক কোন ধর্মীয় নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই প্রদেশ বরাবরই এই অভিশাপ থেকে মুক্ত থেকে গেছে।[৫৬] ১৮৯৩ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পত্রিকা "সারস্বতপত্রে" মন্তব্য করা হয়েছিল

www.pathagar.com

ঢাকার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ভালো সম্পর্কই বিদ্যমান। উভয়ে উভয়ের ধর্মীয় উৎসবাদিতে যোগ দেয় এবং কেউ কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে চায় না। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের উচিত ঢাকাকে অনুসরণ করা।[৫৭] এক সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল ঢাকা শহর। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে শতাধিক বৎসরে মাঝে মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢাকা সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর দিনের পর দিন ধীরে ধীরে মিছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তি সমালোচনায় পরিণত হয়।

পূর্বে উল্লেখ করেছি-১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন হয়, সে বছরও ঈদের মিছিল হয়েছে। কলকাতার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় নিম্নলিখিত শিরোনামে একটি সংবাদ জানা যায়, সরলানন্দ সেনের "ঢাকার চিঠি" থেকে তা উদ্বৃত করা হল ঃ

"সরলানন্দ সেনের "ঢাকার চিঠিতে" ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে "ঢাকায় ঈদের মিছিল" শীর্ষক সংবাদের নিম্নলিখিত অংশটি পাই; ঢাকা ১লা জুলাই। ঢাকা শহরে এবার ঈদের মিছিল উল্লেখযোগ্য। এবারের ঈদ জামাতে ঢাকা শহরের পল্টনের ময়দানে প্রায় ২৫ হাজার লোক সমবেত হয়। এছাড়াও শহরের মসজিদে মসজিদে ঈদের নামাজ পড়া হয়। ঈদের পরের দিন ২৪ শে জুন বুধবার লক্ষাধিক লোকের একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। ঈদ উপলক্ষে পল্টন ময়দানে বৃহস্পতিবার একটি মেলাও বসে। ঈদের দিন অপরাহ্নে কার্জন হলে ঈদ প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বহু বিশিষ্ট শিল্পী গীতিবিচিত্রা দ্বারা এই অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বর্ধন করেন। প্রাদেশিক গভর্নর মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, ভাইস চ্যান্সেলর এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই দিন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রীযুক্ত আচার্য গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ঈদ উপলক্ষে ঈদের পরের দিন বেলা প্রায় ২টার সময় চকবাজার থেকে একটি মিছিল বের হয়। এই মিছিলে লক্ষাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন। মিটফোর্ড, ইসলামপুর, সদরঘাট, নবাবপুর এবং বংশালে রাস্তার দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অসংখ্য লোক এই মিছিল দেখেন। প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠান এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে। ঢাকার অধিবাসীদের সামাজিক অবস্থা মানব জীবনের প্রতি তাদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অবলম্বনে মিছিলে হাস্য কৌতুকাত্মক চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়।

www.pathagar.com

পাকিস্তান আমলের ঈদ মিছিলের দৃশ্য। এগিয়ে চলছে বাদক দল। ছবি– ২৭ জুন ১৯৫২ দৈনিক আজাদ।

www.pathagar.com

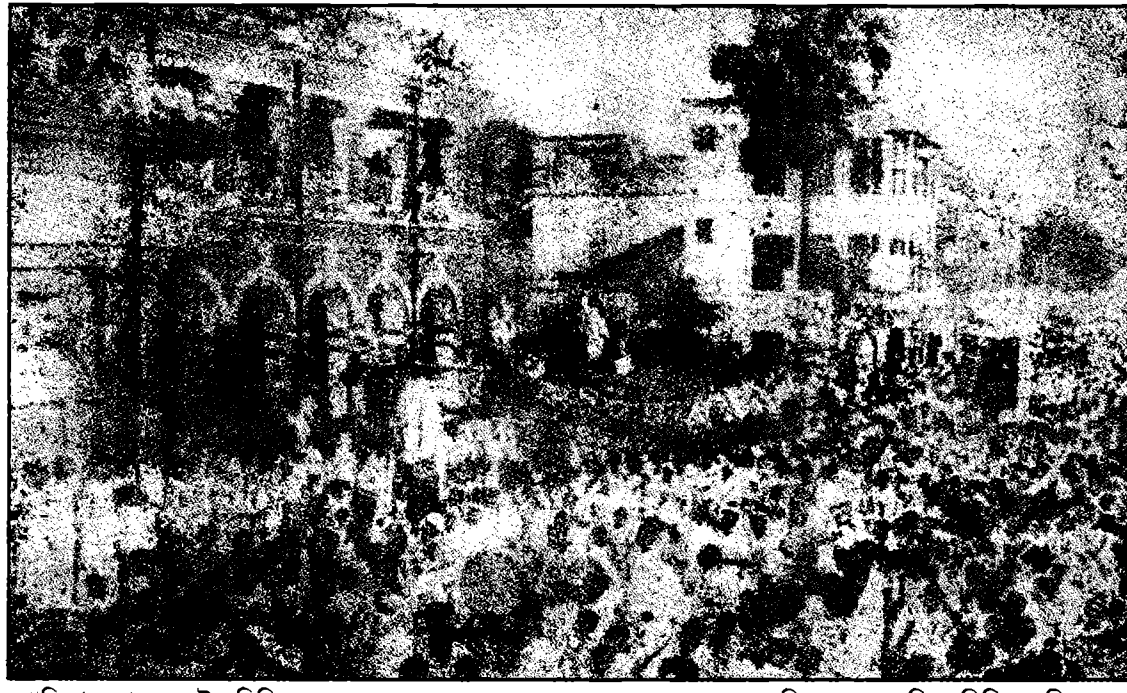

পাকিস্তান আমলের ঈদ মিছিলের দৃশ্য। রায় সাহেব বাজার এলাকার ঢাকা জেলা পরিষদের কাছ দিয়ে মিছিল এগিয়ে চলছে। ব্যানারে লেখা "কাশ্মীর হামারা"। ছবি – ২৭ জুন ১৯৫২ দৈনিক আজাদ।

www.pathagar.com

পাটের স্বল্পমূল্য, ধানচালের অত্যধিক মূল্যে মিউনিসিপ্যালটির ট্যাক্স এবং রাস্তা-ঘাটের দুরবস্থা মিছিলের বিভিন্ন সং সজ্জার মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। এ ছাড়াও "জাতিসংঘ" ঢাকার একটি বিশেষ ক্লাব এবং অতি আধুনিক অভিনয়ের মধ্যে যথেষ্ট হাস্যকৌতুকের পরিচয় মেলে।[৫৮]"

সংবাদের শেষ অংশে ঈদ মিছিলে হাস্যকৌতুকাত্মক চিত্র, সং ও নানা ধরনের সাজসজ্জার বিষয়টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নববর্ষণের ধারা যোগ করেছিল। বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল ঈদের মিছিল।

১৯৫২সালের ঈদ মিছিলের আরেকটি বিবরণ পাই দৈনিক আজাদে। বিস্তারিত সে সংবাদটি উদ্ধৃত করছি।

"ঢাকায় ঈদের মিছিল (ষ্টাফ রিপোর্টার) প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এবারও ঈদের পর দিন ঢাকায় মিছিল বাহির হয়। এ বৎসরের মত এরূপ বিরাট মিছিল ইতিপূর্বে আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্রায় লক্ষাধিক শহরবাসী এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলের পূরোভাগে দুইটি সুসজ্জিত হস্তীসহ বিভিন্ন মহল্লা ও ক্লাবের এক একটি আখড়া বাহির হয়। এই সমস্ত আখড়ার মারফত বিচিত্র সাজসজ্জা দ্বারা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ও শহরের চাল-চলন প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা ও ব্যঙ্গ করা হয়। তন্মধ্যে আল-হেলাল* ক্লাব কর্তৃক কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘের গড়িমসি, রহমতগঞ্জ মহল্লা কর্তৃক কাশ্মীরের ভারতীয় জুলুমের দৃশ্য ব্যঙ্গ করে দেখান হয়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন আখড়ার মারফত ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির অকর্মণ্যতা এবং সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি, চোরাকারবারী, অভিজাত সম্প্রদায়ের অতি আধুনিকতা প্রভৃতিও তীব্র সমালোচনা করা হয়। 'আজাদ কাশ্মীর জিন্দাবাদ', 'কাশ্মীর আমাদের' প্রভৃতি জাতীয় বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্বলিত প্লাকার্ডও এই মিছিলে স্থান পায়। প্রায় এক মাইল দীর্ঘ এই মিছিলটি সাড়ে তিন ঘণ্টা যাবৎ শহরের বড় বড় রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে। মিছিলটি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য মিছিলের সঙ্গে বহু পুলিশ দেওয়া হইয়াছিল।[৫৯]"

১৯৫৩ সালের ঈদ মিছিলের সংবাদটিও দৈনিক আজাদ থেকে তুলে ধরছি।

"বিপুল সমারোহের সহিত ঢাকায় ঈদ উদযাপিত (ষ্টাফ রিপোর্টার) **ঃ** ঈদের পর দিবস ঢাকার প্রসিদ্ধ ঈদের মিছিলটী খুবই আকর্ষণীয় হয়। এই মিছিল দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ নাগরিক নওয়াবপুর রোড, জনসন রোড, সদরঘাট অঞ্চলে বেলা প্রায় ১২টা হইতে অপেক্ষা করিতে থাকে। শহরের বিভিন্ন ক্লাব ও সর্দারগণের উদ্যোগে এই মিছিল বাহির করা হয়।

সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ভিসা অফিসের দুর্নীতি, ঔষধ বিক্রেতাগণ কতৃক চড়া মূল্যে ঔষধ বিক্রয়ের কারসাজি, প্রদেশের খাদ্য সমস্যা, চাষীগণের দুরবস্থা, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার দুর্দশা ও

www.pathagar.com

তাহার প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়ের ব্যঙ্গ রূপ দিয়া জনসাধারণের নিকট আকর্ষণীয়ভাবে তুলিয়া ধরা হয়। গতকল্য (সোমবার) পল্টন ময়দানে ঈদ উপলক্ষে এক বিরাট মেলা হয়।[৬০]

যুগের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঈদ মিছিলের বিবর্তন দেখা যায়। রাজকীয় শান শওকত লুপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা মিছিলে প্রাধান্য পেতে থাকে পরবর্তীতে দেখা যায় ঈদ মিছিল হয়ে উঠেছে বিক্ষোভ আর প্রতিবাদের প্রতীক। কালের করাল গ্রাসে ঈদ মিছিল তাই বাধা প্রাপ্ত হয়েছে।

"ঢাকা জেলায় সভা শোভা যাত্রা নিয়ন্ত্রণ ঃ ঢাকা ১৭ই মার্চ ১৯৫৩ ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৫১ সালের ইস্ট বেঙ্গল অডিন্যান্স ২১ নং এর ১৬ ধারার ১ উপধারা মতে ১২ই মার্চ এক আদেশ জারি করেছেন। সূত্রাপুর, কোতোয়ালী, লালবাগ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জের সমস্ত থানা এলাকায় এই আদেশ প্রযোজ্য। এই আদেশে বলা হয়েছে যে উপরিউক্ত অঞ্চলগুলোতে কোন শোভাযাত্রা বার করতে হলে পূর্বাহ্নে ঢাকায়, ঢাকা শহরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেটের মুন্সীগঞ্জ, ও নারায়নগঞ্জের, মহকুমা পুলিশ অফিসারের এবং মানিকগঞ্জের সার্কেল অফিসারের আদেশ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট অফিসার মিছিল বার করার অনুমতি দেওয়ার সময় আবশ্যক শর্ত আরোপ করতে পারবেন। তার নির্ধারিত বা আদেশক্রমে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মিছিলে লওয়ার নির্দেশও তিনি দিতে পারবেন। শুধু মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞাই নয় ১৯৫১ সালের ইস্ট বেঙ্গল অডিন্যান্স নং ২১ এর ২০ নং ধারা অনুসারে আর একটি আদেশ জারি করে রাজপথ, স্কোয়ারে জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে মানুষের কণ্ঠস্বর উচ্চতর করে প্রচারের জন্য অথবা পুনঃপ্রচারের যন্ত্রচালিত অথবা বিদ্যুৎচালিত লাউড স্পীকার ও মেগাফোন প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি রাত্রি ৯টার পর কোনগৃহে দালান বা প্রকাশ্য স্থানে মানুষের কণ্ঠস্বর উচ্চতর করে প্রচারের জন্য রেডিও বা গ্রামোফোন প্রভৃতি যন্ত্র এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না। যাতে সেই আওয়াজ যন্ত্র ব্যবহারের স্থান থেকে ২০ গজের বাইরে শোনা যায়।[৬১]"

উপরে উল্লেখিত কারণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাজনীতি, আদমজীরায়ট মহল্লায় মহল্লায় দ্বন্দ্ব, ভায়াবহ বন্যা প্রভৃতি কারণে শান্তি ভংগের আশংকায় ১৯৫৪ সালের ৫ই জুন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঈদ মিছিলে বন্ধ করে দেন।[৬২] তারপরও কোন কোন বছর খণ্ড খণ্ড মিছিল হয়েছে বলে জানা যায়।

ঈদ মিছিল যারা তখন উপভোগ করেছেন, এখনও সেসব বয়স্ক ব্যক্তি হাসি আনন্দের কথা ভুলতে পারেন না। এই মিছিল দেখার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন ঢাকায় আসত। মিছিলে যেমন হাসি আনন্দ থাকত, তেমনি থাকত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের অর্থবহ দিকের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। মানুষ তখন অনাবিল ও অনাড়ম্বর হাসি আনন্দে মেতে উঠত।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ঈদ মিছিল ঃ বাংলাদেশ আমল

ঢাকার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ঈদ মিছিল ১৯৯১ সালে হাজারীবাগের "ঢাকাবাসী" সংগঠন কতৃক পুনরায় আরম্ভ হয়। তবে ৬৯ নাম্বার ওয়ার্ড কমিশনার নাজির হোসেন নাজির ঢাকা ঈদ আনন্দমিছিল পরিষদ গঠন করে পুনরায় ঈদ মিছিল প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। মতিঝিলের ক্যাফেঝিল হোটেল মাজেদ সরদার কমিউনিটি সেন্টার, ঢাকা হোটেল ঢাকেশ্বরীর হাজী মোঃ শহীদুল্লাহর বাসায় ১৯৯০ সাল থেকে বিভিন্ন সময় সভা করেন। এ সময় ঢাকার বিভিন্ন এলাকার লোকজন এবং সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মিলিত হন। এ সভায় হাজারী বাগের "ঢাকাবাসী" সংগঠনের সভাপতি শুকুর সালেক ও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

যেহেতু এটি ঈদ মিছিল, রাজনৈতিক মিছিল নয় তাই আহবায়ক নাজির হোসেন নাজির ঈদ মিছিলের সাথে "আনন্দ" শব্দ জুড়ে এটিকে "ঈদ আনন্দ মিছিল" করে দেন।

এ মিছিলের বৈশিষ্ট্য, ঢাকা তথা বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্যের পাশাপাশি, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানে বিভিন্ন সংস্থার ব্যর্থতার বাঙ্গাত্মক চিত্র মিছিলে প্রকাশ পায়। ঢাকাইয়াদের ঐক্যের প্রতীক ঈদ আনন্দ মিছিল।

উৎসব মানে তো মিলন মেলা। যাবতীয় অনুয়া ও বিদ্বেষকে ভুলে গিয়ে মানবিক স্বার্থে নিপাট ঐক্য গড়ে তোলা, উৎসবের সার্থকতা, ঐক্যের মধ্যে নিহিত। ঢাকার ঈদের মিছিলে ঐতিহ্যগত বৈভবও অবয়বকে বহাল রেখে বর্তমান সমাজ সমালোচনার বিষয়ও যুক্ত হয়েছে ঈদ মিছিলের সঙ্গে। ঈদ উৎসবে যুক্ত হয়েছে নব বর্ষণের ধারা।

১৫ মার্চ ১৯৯৪ সাল। ঈদুল ফিতরের পরদিন বিকাল বেলা বেরিয়েছিল ঈদ আনন্দ মিছিল। মেয়র মোহাম্মদ হানিফ শ.শ বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে মিছিল উদ্বোধন করেন। এই গৌরবময় ঐতিহ্য ঈদ মিছিল সমগ্র ঢাকা শহরে ছড়িয়ে

www.pathagar.com

দেয়ার প্রত্যাশা এবং সকল ঢাকাবাসীকে অংশগ্রহণের আহবান জানান। মেয়র বলেন, ঢাকা শহরে বসবাসরত নাগরিকেরা যে কোন রাজনৈতিক দলের হোক না কেন ঢাকার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে এবং ঢাকার উন্নয়ন প্রশ্নে রাজনীতি থাকবে না।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকার সাবেক মেয়র ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত, মোঃ সিরাজউদ্দীন, মাহমুদুর রহমান বাবু, সাইদুর রহমান, ইতিহাস গবেষক ডঃ মুনতাসীর মামুন ছাড়াও ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ বছর ঢাকা শহরের ৩০টি মহল্লার তরুণরা বিভিন্ন সাজে সেজে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। বর্ণাঢ্য ঈদ মিছিলে সুসজ্জিত ঈদ প্লাকার্ড বহন করা হয়। এতে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ারগাড়ি বাদ্যযন্ত্রের দল অংশগ্রহণ করে। অতীতে দিনের মত শাড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে রিকশায় চড়ে পর্দানশীল মহিলা, অনেকে যেমন খুশি তেমন সেজে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। কেউ দৈত্য সেজে, কেউ বর কনে সেজে, কেউ টিপু সুলতান, খাকি হাফপ্যান্ট পরা বৃটিশ আমলের পুলিশ, আবার কেউ রুমি টুপি পরে মহল্লার সরদার সেজে অংশগ্রহণ করে। অনেকে হাতে ঢোল নিয়ে নেচে গেয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। অনেকে বেহারা সেজে পালকি বহন করতে দেখা যায়, দেশ এবং সমাজের বিভিন্ন রকম সমস্যার কথা মিছিলে ফুটিয়ে তোলা হয়। অনেকে মশারি টানিয়ে মশা মারার দল নিয়ে আসেন। অনেকে বিভিন্ন কায়দায় লাঠিখেলা দেখায়, ঐতিহ্যবাহী কাশিদা গায়কের দল বিভিন্ন রকম কাশিদা গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে।

মিছিল শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই সময় এলাকাটি ঢাকাবাসীর মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। ঈদের মিছিলকে কেন্দ্র করে অত্র এলাকার যুব সম্প্রদায় এখানে একটি চমৎকার ঈদ মীনা বাজারের আয়োজন করে থাকেন। ঈদের পরদিন ঈদ মিছিল উদ্বোধন করতে এসে ঢাকার মেয়র এ মেলা পরিদর্শন করেন।

১৯৯৫ সালে ঈদ আনন্দ মিছিল উদ্বোধনকালে মেয়র যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত সংবাদ থেকে তার কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি- মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বলেন, আমি ওয়াদা করেছিলাম সিটি করপোরেশনকে দলীয়করণ করব না। আমি সেই নির্দলীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি। ঢাকায় গত ৫০ বছর যাবৎ এ সময় এ রকম মশাই হয়ে থাকে। কোন সরকারই এ মশা তাড়াতে পারেনি। আমি মশা মারার জন্য অর্থমন্ত্রীর কাছে ৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে তা বরাদ্দ করেননি। এই মশা নিধনের স্থায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছি। এখন যে রকম মশা আছে– আগামীতে তা থাকবে না

www.pathagar.com

ইনশাল্লাহ। তিনি বলেন, ওয়াসার ম্যান হোলের ঢাকনা চুরি হলে, টি, এন্ড, টি রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করলে রাস্তায় পানি জমলে সব কিছুর জন্য দায়ী করা হয় মেয়রকে। কিন্তু মেয়রকে এসব কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় না। ঢাকা এবং ঢাকার নগরবাসীর জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত সকল কাজের দায়িত্ব সিটি করপোরেশনকে দেয়া হলে সুসমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সকল কাজ সম্পন্ন হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এতে জনগণের ভোগান্তি যেমন কমবে তেমনি অর্থের অপচয়ও বন্ধ হবে। তিনি বলেন, এই ঢাকার উন্নয়নে এবং নাগরিকদের কল্যাণে আমি এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতার অভাবে যদি আমি ব্যর্থ হয়ে যাই, তবে আপনাদের নিয়ে এমন একটি মিছিল বের করবো যা থাকবে সকল রাজনীতির উর্ধ্বে যার আহ্বান থাকবে ঢাকাকে বাঁচান। ঢাকাবাসীকে বাঁচান। তিনি বলেন, সিটি করপোরেশন কারো দয়ায় নয় জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় চলে।[৬৩] ঈদ আনন্দ মিছিলকে কেন্দ্র করে মিছিল চলার রাস্তাগুলিতে, নর্থ সাউথ রোড হয়ে আলুবাজার, আবুল হাসনাত রোড, আগাসাদেক রোড ও কায়েৎটুলী জামে মসজিদের কাছে বাঁশ ও রঙিন কাপড়ের সুদৃশ্য "তোরণ" নির্মাণ করা হয়।

১৯৯৬ সালের মিছিল ও বিগত বছরের মতই অনুষ্ঠিত হয়। ঈদ মিছিলে দেখা যায় ঢাকার লোকজন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে এগিয়ে আসছে। প্রতিটি দলের সঙ্গে রয়েছে ব্যানার। সেসব ব্যানারে বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভালোবাসা, শান্তি ও সুখের প্রত্যাশা বিষয়ে বাণী লেখা রয়েছে।

বিভিন্ন যানবাহনের চলমান মঞ্চে দেখতে পাই, এর উপর নাটকীয় উপস্থাপনা। স্যাটায়ার ধর্মী নাটিকা এখানে উপস্থাপনা করা হয়। এদের লক্ষ্য বাস্তবকে তুলে ধরা। এদের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও কীর্তিকলাপ দেখে দর্শক যে মুগ্ধ হন, সেটা তাদের হাস্যরসের মধ্যে টের পাওয়া যায়। রাস্তার দু'পাশে এবং দালান কোঠার ছাদে দাঁড়িয়ে মানুষ উপভোগ করে এই সব দৃশ্য।

১৯৯৭ সালেও মিছিলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকাবাসী তাদের দৈনন্দিন নাগরিক সমস্যাগুলো গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরলেন-হাতের তৈরি একটি বিরাট আকৃতির মশা নিয়ে মিছিল করলেন, অন্যান্য সমস্যা যেমন পানি সংকট গ্যাস সংকট, আর বিদ্যুৎ সংকটের তারা মহড়া দেখালেন। মিছিলকারীরা আওয়াজ তুললেন মাননীয় মেয়র এসব সমস্যার সমাধান করুন। মশার উপদ্রব থেকে ঢাকাবাসীকে বাঁচান। নগরী যানজট মুক্ত করে মানুষকে স্বস্তি দিন। মেয়র এসব কথা স্বীকার করে নিলেন।

www.pathagar.com

তিনি বক্তব্য দিলেন, এসব অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা নয়, ফাঁকা নয়। এমন ঢাকা আমরা চাইনা। আমরা একটি মানবিক ঢাকা পেতে চাই। তিনি বললেন, ঢাকা শহর একদিন এরকম ছিল না। আমাদের আরো দায়িত্ববান হয়ে মানবতাবোধ জাগিয়ে তুলে কাজ করে যেতে হবে। তাহলে আমরা ঢাকায় শান্তির সাথে বসবাস করতে পারবো। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের সাবেক ভিসি মোহাম্মদ শাহজাহান, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও শিল্পী হাশেম খান, আলহাজ্ব আবদুস সালাম, মীর্জা আবদুল খালেক, হাজী সেলিম এমপি, নেশন টুডে সম্পাদক জিল্লুর রহিম দুলাল প্রমুখ।

মেয়র ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে এ মিছিল উদ্বোধন করেন, এরপর ঢাকার বিভিন্ন সংগঠন ও এলাকাবাসী একে একে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যান এবং তুলে ধরেন তাদের সমস্যা। ইয়ং বয়েজ ক্লাবের সদস্যরা বিশালকার একটি মশা নিয়ে আসেন। তারা বলেন, হানিফ ভাই মশামুক্ত ঢাকা চাই। মশার কামড় মানুষের কষ্টের অবস্থা বুঝানোর জন্য তারা কয়েল জ্বালিয়ে আহ্ উহ্ চিৎকার করেন। একটি মজাদার ছড়ার ব্যানার নিয়ে এসেছিলেন সিক্কাটুলী স্মরণী সংঘ তাতে লেখা ছিল খাইছেরে খাইছে, কুমির বাঘেরে খাইছে আর মশা খাইছে গাফপি মাছেরে। মেয়র সুসজ্জিত মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে দেখেন এসব প্রতীকী উপস্থাপনাগুলো। মিছিলে বলা হয়, ঢাকা শহরের যানজটের চিরাস্থায়ী সমাধান চাই। যানজটের কারণ এবং এ জট সমাধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা ধরনের ব্যাঙ্গাত্মক ব্যানার ও পোস্টার বহন করে মিছিলকারীরা।

আজগর লেন এলাকাবাসী পশু ও অতিথি পাখি নিধনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। প্রত্যাশা সংগঠন মাদকমুক্ত ঢাকা চাই বলে শ্লোগান দেয়। সুরীটোলা রাইট ব্রাদার্স ক্লাব ভাষা আন্দোলনের মাস একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে মিছিলে তুলে ধরে অ, আ, ক, খ, বর্ণমালা। একটি সংগঠনের মিছিলকারীরা তাদের ব্যানারে লিখেছিলেন "আব্বা আমার জন্য মাইয়া দেখতে আইসা অহন দেখি তুমি নিজেই বিয়া কইরা বইছো। মাওলা বকশ সরদার মেমোরিয়াল ট্রাস্টের "ঢাকা কেন্দ্র ঈদ মিছিলের মঞ্চের পাশে একটি ষ্টলে ঢাকা বিষয়ক গ্রন্থের প্রদর্শনী করে।

ঈদ মিছিলে হাতি

১৯৯৮ সালে ঢাকা মহানগরী সমিতির পক্ষ থেকে ঈদ আনন্দ মিছিলে একটি হাতি উপস্থাপন করা হয়। হাতিটিকে সুন্দর সাজে সাজিয়ে পিঠে নকল নবাব বসিয়ে সৈন্য সামন্ত সহকারে মিছিলের অগ্রভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। হাতির পিঠে

www.pathagar.com

নবাব সেজে বসেছিলেন নাজিরা বাজার নিবাসী দীন মোহাম্মদ তার পিছনে বসেছিলেন ঢাকা সমিতির নির্বাহী সদস্য মোঃ আলমগীর। খোলা তরবারি হাতে নিয়ে বসেছিলেন। তিনি হাতির পিঠে বসে উদার হস্তে আশরাফি বিতরণ করছিলেন। দর্শকরা দারুণ উপভোগ করেছিল এই বিষয়টি। ১৯৯৮ সালের ঈদ মিছিলের মঞ্চে অত্র গ্রন্থ লেখক "ঢাকা ঈদ আনন্দ" মিছিল শিরোনাম একটি কবিতা পাঠ করেন। এটি অত্র গ্রন্থ লেখকের ঢাকার বিষয়ক বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি নামক ছড়া ও কবিতা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

ঈদ মিছিলে হাতি। ছবি- ১৯৯৮।

www.pathagar.com

ঈদ মিছিলের আলোকচিত্র প্রদর্শনী

"ঢাকা ঈদ আনন্দ মিছিল পরিষদের উদ্যোগে ১৯৯৮ সনে মাজেদ সরদার কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় ঈদ মিছিলের আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও এর সাথে থাকে ঈদ মিছিলের পর্যালোচনা সভা। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন আহবায়ক নাজির হোসেন নাজির। এতে প্রচুর দর্শকের আগমন ঘটে। এ চমৎকার প্রদর্শনী আমি নিজেও দেখেছি। '৯৬, '৯৭ সনেও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সদস্য সচিব এম আর ফারুক আহমেদ। ঈদ মিছিল চলাকালীন সময়ে তিনি মিছিলে ধারা বর্ণনা উপস্থাপনা করে থাকেন।

৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সালে কায়েৎটুলী মহল্লাবাসী একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ১৯৯৭, ১৯৯৮ সালে কায়েৎটুলী মহল্লাবাসী দ্বিতীয় এবং ১৯৯৯ সালে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী যেমন খুশি তেমন সাজাতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করে তাদেরকে উৎসাহিত করেন। এ অনুষ্ঠানে কায়েৎটুলী মহল্লাবাসী তাদের ঈদ মিছিলের ছবি প্রদর্শন করেন।

ঢাকাইয়াদের ঈদ আনন্দ মিছিল শুধু আনন্দ পদশোভা যাত্রা নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে বোধের বাগিচায় ফুটে থাকা ঐতিহ্যের পুষ্পিত সুগন্ধি। বর্তমানে ঢাকার ঈদ মিছিলে দেখা যায় নাগরিক সমস্যাবলীর প্রতি নান্দনিক ঘৃণা।

১৯৯৯ সালের ঢাকা ঈদ আনন্দ মিছিল পরিষদের মিছিল উদ্বোধনের সময় মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বলেন, ঢাকার স্থানীয় লোকেরা প্লট বরাদ্দ পেতেন না। এখন তারা নিয়ম অনুসারে প্লট বরাদ্দ পাবেন। তিনি ঢাকার জনজীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা ঈদ আনন্দ মিছিল পরিষদের আহবায়ক নাজির হোসেন নাজির তার বক্তৃতায় ফুলবাড়ীয়া এলাকায় বঙ্গবাজার মার্কেট উচ্ছেদ করে সেখানে এলাকাবাসীর জন্য একটি খেলার মাঠ তৈরির প্রস্তাব করেন এবং এ বিষয়ে তিনি পুরানো ঢাকাবাসীদের সচেতন হতে বলেন। এ বছর "ঢাকাবাসী সংগঠন" হাজারীবাগ এলাকার একটি পার্কে সাত দিনব্যাপী লোকজ সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করে।

ঢাকা সমিতির আয়োজিত ঈদ মিছিল

নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ২০০০ সালের ঈদ মিছিলের আয়োজন করে ঢাকা মহানগরী সমিতি। ঈদ মিছিলের আহবায়ক বিদেশে থাকার কারণে ঢাকা মহানগরী সমিতিকে মিছিলের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। ঢাকা সমিতির মহাসচিব এস এম নাজিমউদ্দীনকে ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক করা হয়।

ঈদ-মিছিল প্রস্তুতির যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে ১০ জানুয়ারি ২০০০ বিকাল বেলা ঢাকা সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বর্ণাঢ্য ঈদ

www.pathagar.com

আনন্দ মিছিল। ঢাকা শহরের সতেরটি মহল্লা ও সংগঠনের হাজার হাজার মানুষ এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

ঢাকা মহানগর সমিতির পক্ষ থেকে মেয়র মোঃ হানিফ সাবেক মেয়র মির্জা আব্বাস ও স্থানীয় সংসদ সদস্য সাদেক হোসেন খোকাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় উল্লেখিত তিনজনই অনুপস্থিত ছিলেন। মেয়র শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হতে পারেন নাই। তার অনুপস্থিতিতে লালবাগ থানার সংসদ সদস্য হাজী মোঃ সেলিম প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করে মিছিল উদ্বোধন করেন। মঞ্চে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন হাজী সেলিম এম পি। আনন্দ শোভাযাত্রায় শরিক হয়েছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। ঢাকার ঐতিহ্য ও নবাবী আমলের নানা জৌলুসময় কর্মকাণ্ড এ মিছিলে তুলে ধরা হয়। মিছিলকারীদের মধ্যে ছিল শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী ও যুবক, তারা সেজেছে রঙ বেরঙের পোশাকে। এ বছর মিছিলে একটি ট্রাকে নবাব সেজে একজন বসেন, তাকে একজন সরাব ঢেলে দিচ্ছে। তার সামনে নৃত্য করছে একজন নর্তকী। এছাড়া মিছিলে ঢাকা উইমেন ক্লাব, নবাব সিরাজদৌল্লার হত্যার দৃশ্য তুলে ধরে। একটি ট্রাকে বাঁশের করঞ্চি দিয়ে জেলখানা তৈরি করা হয়। জেলের ভিতরে ছুরি হাতে কালো পোশাক পরা জল্লাদ নবাব সিরাজদৌল্লাকে হত্যা করে। কেউ বা বাউল সেজে মিছিলে অংশগ্রহণ করে।

ট্রাকের চলমান মঞ্চে নবাবী দরবার।

www.pathagar.com

ঢাকার বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়। রিকশায় মহিলাদের কাছ থেকে ছিনতাইকারী সোনার গহনা, পিস্তল ঠেকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা তুলে ধরা হয়। পুলিশের ঘুষ খাওয়ার দৃশ্য, নারী নির্যাতন, শিশু ধর্ষণকারীদের শাস্তি ও এসিড নিক্ষেপকারীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়ার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও নগরীর নিত্য ঘটনা টেণ্ডার দখলের ব্যঙ্গচিত্র তুলে ধরা হয়।

বঙ্গ বাজার মার্কেট চাই না খেলার মাঠ চাই, ট্রাকের চলমান মঞ্চে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার মাধ্যমে এ দাবি জানান হয়। ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে পুরানো ঢাকা থেকে স্থানান্তর করে ঢাকার বাইরে স্থাপন করার দাবি জানান হয়, সেখানে নতুন রাস্তা নির্মাণ ও বিনোদনমূলক জায়গা পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরির প্রস্তাব করা হয়।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নামে বুড়িগঙ্গা সেতুর নামকরণের দাবি তুলে ধরে সৈয়দ হাসান আলী লেন ব্যবসায়ী সমিতি। একটি খোলা ট্রাকে বডি বিল্ডিং প্রদর্শন করে "ঢাকা ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার" এর কর্মীরা। তাদের শ্লোগান ছিল আমরা ভাসমান অবস্থায় আছি, আমাদের কোন জায়গা নেই। সন্ত্রাস নয় স্বাস্থ্য চাই। তাদের পেশী বহুল হাতে শোভা পেয়েছে বারবেল। এদেশের সুন্দরীদের বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার দৃশ্য বিভিন্ন সাজসজ্জার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। বীণ হাতে সাপুড়ে, ঝাপিতে রাখা খেলনা সাপ, বেদেনী পরিবারের দৃশ্যটি ছিল চমৎকার।

২০০০ সালের ডিসেম্বরে ঈদ মিছিলের আয়োজন করে ঢাকা মহানগরী সমিতি। এ মিছিল উপলক্ষে ঢাকা সমিতির অফিসে তিনটি সভা করে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

ঈদের দ্বিতীয় দিন মিছিল শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন আহবায়ক নাজির হোসেন নাজির। তিনি বলেন, ঢাকায় ঈদের মিছিল গত ৪২ বছর বন্ধ ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে ঈদ মিছিল আর আয়োজন করা হয়নি। এরপর ১৯৯৪ সাল থেকে ঈদ মিছিল পুনরায় আরম্ভ হয়। ঢাকা মহানগর সমিতির মহাসচিব এস এম নাজিম উদ্দিন বলেন, ঈদ মিছিলের মাধ্যমে ঢাকার বিশেষ করে ঢাকার আদিবাসীদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সামাজিক সমস্যা ফুটে উঠে। নৈরাজ্যের এ সময়ে ঈদের আনন্দ মিছিল সামান্য হলেও ঢাকার মানুষকে আনন্দের সুযোগ করে দিয়েছে। সংসদ সদস্য হাজী সেলিম সন্ত্রাস প্রতিরোধে ঢাকাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এ বছর মেয়র হানিফ তনয় সাঈদ খোকন মিছিলে বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছিলেন। মেয়র ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি বলেন, ঢাকার একটি সুন্দর অতীত এবং ইতিহাস ঐতিহ্য রয়েছে। যুগের বিবর্তনে তা লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আজ খুব খুশি লাগছে। হারিয়ে যাওয়া একটি ঐতিহ্য ঈদ মিছিল আমরা আবারও ঢাকার বুকে করতে পারছি। সবার ঐক্যবদ্ধ

www.pathagar.com

প্রচেষ্টায় তা ধরে রাখতে হবে। তিনি এক ঝাঁক বেলুন উড়িয়ে দিয়ে মিছিল উদ্বোধন করেন।

২০০০ সালে ঈদের তৃতীয় দিন ডিসেম্বরে ঢাকাবাসী সংগঠন হাজারীবাগ থেকে একটি মিছিল বের করে। প্রধান অতিথি ছিলেন মেয়র হানিফ। চিত্রনায়ক নাঈম আলোচনায় অংশ নেন। এই মিছিলের আকর্ষণ ছিল কাশিদা দলগুলোর কাশিদা পরিবেশন। মিছিল শেষে মেহেদী উৎসব ও কাশিদা প্রতিযোগী বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২০০১ সালে ঈদ ও বিজয় দিবস একসঙ্গে এসেছে। সাধারণত এরকম হয় না। ঈদ পালিত হয় হিজরি সন মোতাবেক। হিজরি চান্দ্র মাস। বিজয় দিবস উদযাপিত হয় খৃষ্টীয় সন অনুযায়ী। ঈদ হলো আনন্দ। প্রসারিত অর্থে আনন্দোৎসব। আর বিজয় দিবসে বিজয়ের আনন্দোৎসব। আনন্দের এ দুটি উৎসবই জাতীয় আনন্দোৎসব। ঈদুল ফিতর ও বিজয় দিবসের যুগল আনন্দোৎসবে এবার দেশবাসী আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছে।

হাজারীবাগের "ঢাকাবাসী" সংগঠন এ বছর বঙ্গ ভবনের প্রধান ফটকের সামনে থেকে ঐতিহ্যবাহী এই আনন্দ মিছিল বের করে। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক একিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বেলুন উড়িয়ে মিছিল উদ্বোধন করেন। মিছিল উদ্বোধনের সময় যে বক্তব্য দিয়েছিলেন দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত সংবাদ থেকে তার কয়েক লাইন তুলে ধরছি। "প্রেসিডেন্ট পুরানো ঢাকায় তার শৈশবের স্মৃতিচারণ করে বলেন, পুরানো ঢাকার একটি গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে, যা আমাদের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যের অংশ। তিনি বলেন, পুরানো ঢাকার জনগণের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। যা জাতির বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকাশের স্বার্থে সংরক্ষণ ও লালন করা উচিত। পুরানো ঢাকার বাসিন্দাদের চট করে রসালো মন্তব্য করার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাস লণ্ডনবাসীদের তুলনা করা চলে"।[৬৪]

ঢাকা মহানগরী সমিতির আনন্দ মিছিল শুরু হয় সুরীটোলা নর্থ সাউথ রোড থেকে। ঢাকা মহানগরীর সাবেক মেয়র, গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাস এই মিছিল উদ্বোধন করেন। তিনি ঢাকা সমিতির আজীবন সদস্য।

২০০২ সালে ঢাকা সমিতি ঈদ মিছিল আয়োজন থেকে বিরত থাকে। দৈনিক প্রথম আলোর প্রকাশিত সংবাদ থেকে এর কারণ জানা যায়। তা এই রকম "ঢাকা সমিতি এবার ঈদ মিছিল করবে না।" ঈদ মিছিল পুরান ঢাকার ঐতিহ্য। প্রতিবছরই এই ঈদ মিছিলের আয়োজক ঢাকা সমিতি। কিন্তু এ বছর সামাজিক দুরাবস্থা এবং অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ঈদ মিছিলের কর্মসূচি বাদ দেয়া হয়েছে। গত রোববার সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সভায় এবারের ঈদ মিছিল না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় বলা হয়, ব্যবসায় মন্দা যাওয়ায় মিছিল সংগঠিত করতে যারা আর্থিক সহযোগিতা করত তারা এবার অপারগতা

www.pathagar.com

প্রকাশ করেছে। এছাড়া সম্প্রতি যৌথ অভিযানের ফলে পুরান ঢাকায় যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা এবার ঈদ মিছিলে প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব অসুবিধার কথা ভেবেই ঈদ মিছিলের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে। সমিতির সভাপতি সরদার কুদ্দুসের সভাপতিতে সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত, ছিলেন, মহাসচিব এস. এম. নাজিমউদ্দীন, মোঃ সালাহউদ্দীন, মোঃ নাসির উল্লাহপ্রমুখ।[৩৮]

হাজারী বাগের ঢাকাবাসী সংগঠনের উদ্যেগে ২০০২ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ঈদ মিছিলের নেতৃত্বদেন বন ও পরিবেশমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ। শিশু একাডেমী থেকে শুরু করে মিছিলটি প্রেসক্লাব গিয়ে সমাপ্ত হয়। বিগত বছরগুলোর মত এবারও বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়। তবে "ঢাকাবাসী" সংগঠনের ঈদ মিছিলে চকবাজার রোডটির নাম পরিবর্তন না করার জন্য সিটি করপোরেশনের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

বিগত কয়েক বছর থেকে খাজা দেওয়ান পঞ্চায়েত কমিটি (প্রথম লেন) ঈদ মিছিলের আয়োজন করে আসছে। মিছিলটি খাজা দেওয়ান এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ঈদের পরদিন বিকালে মিছিলের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ সেলিম এক বার এ মিছিল উদ্বোধন করেছেন বলে জানা যায়।

২০০৩ সালের নভেম্বরে হাজারীবাগের ঢাকাবাসীর সংগঠনের মিছিলটি উদ্বোধন করেন সাংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান। শিশু একাডেমী থেকে মিছিলটি জাতীয় প্রেসক্লাব হয়ে বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে। এ বছর ঢাকাবাসী ঈদ মিছিলের স্লোগান ছিল ঢাকার প্রাণ বুড়িগঙ্গা বাঁচান। এ বছরও ঢাকা সমিতির ঈদ মিছিল স্থগিত রাখা হয়।

সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান রাজধানীতে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঢাকাবাসী আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী ঈদ আনন্দ মিছিল ও র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন।

www.pathagar.com

ঢাকা সিটি করপোরেশনে সংবর্ধনা

১৯৯৪, '৯৫ ও '৯৬ তিন বছর হাজী শেখ ওয়াজেদ আলী বাবুলের নেতৃত্বে সাত রওজা এলাকাবাসী চ্যাম্পিয়ান হয়। ঢাকা ঈদ আনন্দ মিছিল পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকা সিটি করপোরেশন মিলনায়তনে ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে সম্মাননা প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে বুয়েটের ভিসি ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহান, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান আজিম বকশ, মোঃ শাহজাহানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। মেয়র হানিফ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাকে পাকিস্তানের তৈরি একটি বড় আকারের কাপ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে শেষে হাজী শেখ ওয়াজেদ আলী বাবুলকে ছোট খাট মিছিল করে বাসায় পৌঁছে দেয়া হয়। মিছিলের সামনে ছিল ব্যান্ডপার্টির জোরালো বাজনা। এরপরও সাত রওজা এলাকাবাসী '৯৭ ও '৯৮ সালে হাজী বাবুলের নেতৃত্বে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। '৯৯ থেকে ২০০১ সালে সাত রওজা এলাকাবাসী মিছিলে অংশগ্রহণ করে নাই।

ঈদ মিছিলে চ্যাম্পিয়ান হওয়াতে কায়েৎটুলি মহল্লাবাসিকেও ১৭ জুন ২০০১ইং ঢাকা সিটি করপেরেশনে সম্বেধনা দেওয়া হয়। মেয়র হানিফ শেখ আনসার আলীর হাতে ট্রফি তুলে দেন।

ব্যান্ড পার্টির বহর।

www.pathagar.com

পুরস্কার বিতরণ

ঈদ মিছিলে বিচারকমণ্ডলী রায় দেয়ার পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মিছিল দীর্ঘ আকৃতির জন্য ১০ নম্বর, শৃংখলা ১০, চমৎকার সাজসজ্জা ৪০, এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য ৪০ নাম্বার দেয়া হয়। মোট ১০০ নম্বর। যদি ড্র হয়ে যায় তাহলে চেয়ারম্যান সাহেব তখন ক্ষমতা অনুযায়ী নিরপেক্ষতা বজায় রেখে একটি ভোট দিয়ে বিচারের রায় দিয়ে থাকেন। ৫ জন বিচারকের মোট ৫০০ নম্বরের মাধ্যমে মিছিলকারী সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে থাকলে প্রথম স্থানে রায় দেয়া হয়।

১৯৯৪, '৯৫ এবং '৯৬ সালে বিশেষ অতিথি কমিশনার গোলাম মোর্শেদ, মীর সমীর, মেয়র হানিফের বড় ভাই আবদুল মজিদ, আহবায়ক নাজির হোসেন নাজির এবং মাহমুদুর রহমান বাবু পুরুস্কার বিতরণ করেন। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এ মিছিলে প্রথম পুরস্কার ২০ ইঞ্চি রঙ্গিণ টি ভি ও দ্বিতীয় পুরস্কার ২০ ইঞ্চি সাদা কালো টিভি এবং তৃতীয় পুরস্কার একটি টু ইন ওয়ান দেয়া হয়। এ ছাড়া মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মহল্লা ও সংগঠনকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কারের মধ্যে সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, চার্জ লাইট, ঝাড়বাতি, ওয়াল ঘড়ি, ব্লেণ্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি দেয়া হয়।। উল্লেখিত পুরস্কারের সাথে প্রতিটি দলকে একটি সুদৃশ্য ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। ক্রেষ্টে লেখা থাকে। **আমার গর্ব, আমি ঢাকাইয়া**

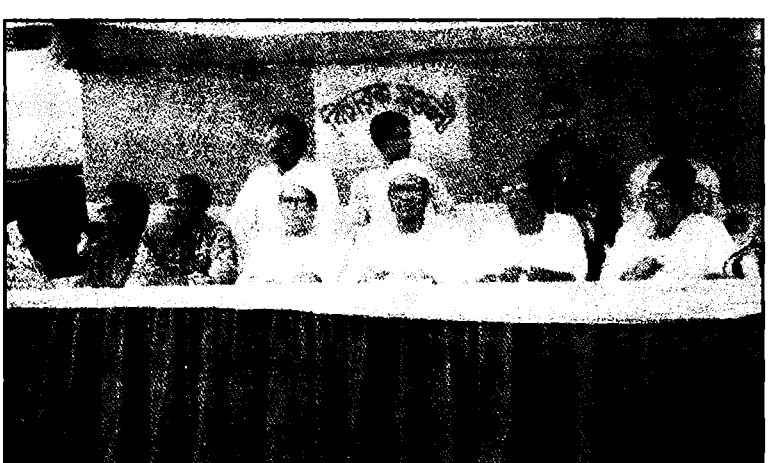

১৯৯৬ সালের বিচারকমন্ডলী। ডান দিকে বসে আছেন আলহাজ্ব মোঃ সাখী মিয়া, মনসুর উদ্দীন আহমেদ মুসা, আলহাজ্ব আবদুস সালাম, সাইদুর রহমান সাঈদ ও পেছনে চশমা পরিহিত দাঁড়ানো মির্জা আবদুল খালেক।

www.pathagar.com

ক্রেষ্টের মনোগ্রামটি নবাব মীরজুমলার তৈরী ঐতিহ্যবাহী ঢাকা তোরণ। এই ঐতিহাসিক নির্দশনটি বর্তমানে বিলুপ্ত হওয়ার পথে। এটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষণ করা উচিত।

১৯৯০ সালের পর থেকে আমার নিজের দেখা ঈদের মিছিল অত্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আনন্দময় ঈদের মিছিল যেই দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। প্রতিবছর টেলিভিশনে গুরুত্বের সাথে ঈদ মিছিল সংবাদ দেখানো হয়েছে।

ঈদের মিছিলে ঢাকা মহানগরীর বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির একটি চিত্র পাওয়া যায়। ঢাকাইয়াদের ধর্মবোধ, পেশা, সংস্কার, সামাজিক উৎসব থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ ভালবাসা দুঃখ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে ঈদের মিছিলে। শত শত বছরের প্রাচীন ঢাকা মহানগরীর মানবজীবনের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতিভাস হয় ঈদের মিছিলে। এ মিছিল বা শোভাযাত্রায় ঢাকার ইতিহাস ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধান করা যায়। জনসাধারণের সমাজ চিন্তা সংস্কৃতির চিন্তার বিশেষ প্রতিফলন দেখা যায়।

উৎসব মানেতো মিলিত হওয়া, একতাবদ্ধ হওয়া, যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে মৌলস্বার্থে ঐক্য ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা। উৎসবের সাফল্য ও সার্থকতা সেখানে নিহিত। ঔপনিবেশিক আমলে এসেও ঢাকাইয়াদের ঈদ উৎসবের জাঁকজমক কমেনি। যে সমাজ মন খুলে আনন্দ করতে জানে সে সমাজ বলবান, তার মধ্যে দ্বিধা বা সংকোচ বা ভীরুতার বন্ধন থাকে না। আনন্দ-উৎসবে মন থাকে সরস ও সচেতন। আমরা দৃষ্টি প্রসারিত করলেই দেখতেই পাই যাদের আনন্দ আছে তারা জীবন্ত। আদিম যুগে মানুষ যখন সমাজ জীব হিসাবে বাঁচার তাগিদ অনুভব করেছে। তখন থেকেই সে বিভিন্ন রকম উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্ভাবনে সচেষ্ট থেকেছে। সে আনন্দ প্রকাশের জন্য মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন উৎসবের। এর ফলে মানুষের সমঝোতা সম্প্রীতি বন্ধন, প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে।

ঈদ শুধু আনন্দের দিন নয়। সৌহার্দ্যের দিনও তাই এদিনে দেখা যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হিন্দু মুসলমানের চলে কোলাকুলি অভিবাদন ও সৌহাদ্য বিনিময়। বর্তমানে আমাদের ঈদ উৎসব মন ও মস্তিষ্কে আনন্দ দিবার মতো কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও নাই। ঈদের মিছিলের যে আনন্দ তা সাধারণ আনন্দ বলা যায় না। এখানে উল্লাস থাকে বলে মানুষ পুলকানন্দে ফাটিয়া পড়ে। আনন্দ উৎসবের উন্মত্ততায় উদযাপন করা যদি কখনও দেখা দেয় তবে তা ঈদের

www.pathagar.com

আনন্দ মিছিলে। ঢাকার চিরায়ত ঐতিহ্যের প্রাণময় সম্মোহনী। বছরব্যাপী ঢাকাবাসীর মনে যে নাগরিক যন্ত্রণা। তা অফুরন্ত আনন্দ উল্লাসের মধ্যে ঢাকাবাসী ভুলতে পারে না। তাই মিছিলে উঠে আসে সারা বছরের নাগরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকুতি। ঈদের মিছিল শুধু আনন্দ পদশোভা যাত্রা নয় এর সাথে রয়েছে সামাজিক অসংগতির শৈল্পিক প্রতিবাদ। ঈদের পরদিন বিকেলে ঢাকার মানুষ কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কেউ ছাদে, কেউবা জানালা খুলে প্রতীক্ষার প্রহরগুনে রাজপথে ঈদ মিছিলের জৌলুস দেখবে বলে।

ঈদ মিছিলের ইতিহাস ঐতিহ্য চিরদীপ্যমান। আমাদের পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে পাওয়া ঈদ আনন্দ মিছিলের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা পালন করে যেতে হবে। এ জন্য দীপ্ত শোভাযাত্রার বিপুল প্রসারের প্রয়োজন রয়েছে।

www.pathagar.com

ঈদ মিছিলে পুরস্কার প্রাপ্ত দল

ঢাকা ঈদ আনন্দ মিছিল পরিষদের মিছিলে (পরবর্তীতে ঢাকা সমিতি আয়োজিত) ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত সংগঠন বা মহল্লাবাসী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তার তালিকা নিম্নে দেয়া হলঃ

১৯৯৪	
১। সাত রওজা এলাকাবাসী	প্রথম পুরস্কার
২। আগামসিহ লেন এলাকাবাসী	দ্বিতীয় "
৩। নাজিমুদ্দিন রোড এলাকাবাসী	তৃতীয় "
১৯৯৫	
১। সাত রওজা এলাকাবাসী	প্রথম পুরস্কার
২। আগামসিহ লেন এলাকাবাসী	দ্বিতীয় "
৩। আশার আলো সমাজ কল্যাণ সংগঠন	তৃতীয় "
১৯৯৬	
১। সাত রওজা এলাকাবাসী	প্রথম পুরস্কার
২। বংশাল এলাকাবাসী	দ্বিতীয় "
৩। চাঁনখারপুল সমাজ কল্যাণ সমিতি	তৃতীয় "
১৯৯৭	
১। সাত রওজা এলাকাবাসী	প্রথম পুরস্কার
২। কায়েৎটুলী মহল্লাবাসী	দ্বিতীয় "
৩। বংশাল এলাকাবাসী	তৃতীয় "
১৯৯৮	
১। সাত রওজা এলাকাবাসী	প্রথম পুরস্কার
২। কায়েৎটুলী মহল্লাবাসী	দ্বিতীয় "
৩। সঠিক তথ্য জানা যায়নি	
১৯৯৯	
১। কায়েৎটুলী মহল্লাবাসী	প্রথম পুরস্কার
২। সুরিটোলা রাইট ব্রাদার্স ক্লাব	দ্বিতীয় "
৩। আগা নওয়াব দেউরী সমাজ কল্যাণ সংঘ	তৃতীয় "
২০০০ জানুয়ারী	
১। কায়েৎটুলী মহল্লাবাসী	প্রথম পুরস্কার
২। সুরিটোলা রাইট ব্রাদার্স ক্লাব	দ্বিতীয় "
৩। আগামসিহ লেন যুব কল্যাণ সংসদ	তৃতীয় "
২০০০ ডিসেম্বর	
১। কায়েৎটুলী মহল্লাবাসী	প্রথম পুরস্কার
২। সুরিটোলা রাইট ব্রাদার্স ক্লাব	দ্বিতীয় "
৩। জিন্নাতুল বাকিয়া ৭১ নং ওয়ার্ড	তৃতীয় "
২০০১	
১। কায়েৎটুলী মহল্লাবাসী	প্রথম পুরস্কার
২। সুরিটোলা রাইট ব্রাদার্স ক্লাব	দ্বিতীয় "
৩। ঢাকা শরীরচর্চা কেন্দ্র	তৃতীয় "

www.pathagar.com

বিচারক মন্ডলী

ঢাকা ঈদ আনন্দ মিছিল পরিষদের (পরবর্তিতে ঢাকা সমিতি) মিছিলে যে সব সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের নাম ও পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হল।

নাম ও পরিচিতি	পদবী
১৯৯৪	
১। নাজির হোসেন সভাপতি আজাদ মুসলিম ক্লাব ২। মীর সমীর, ৭০ নং ওয়ার্ড কমিশনার ৩। আজিজুল্লাহ, ৬৩ নং ওয়ার্ড কমিশনার ৪। আবদুল মজিদ, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী ৫। গোলাম মোর্শেদ ৬৭ নং ওয়ার্ড কমিশনার	বিচারক মন্ডলীর সভাপতি
১৯৯৫	
১। নাজির হোসেন পুর্বোক্ত ২। গোলাম মোর্শেদ ৩। হুমায়ুন কবির ৪। আজিজুল্লাহ ৫। মীর সমীর	ঐ
১৯৯৬	
১। মনসুর উদ্দীন আহমদ মুসা, সহ-সভাপতি ঢাকা সমিতি ২। আলহাজ্ব মোহাম্মদ সাখী মিয়া, সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার ৩। আলহাজ্ব আবদুস সালাম, সহ-সভাপতি ঢাকা সমিতি ৪। মীর্জা আবদুল খালেক, চেয়ারম্যান কাদের সরদার ফাউন্ডেশন ৫। সাঈদুর রহমান সাঈদ, রাজনীতিবিদ সমাজ সেবক	ঐ
১৯৯৭	
১। মনসুর উদ্দীন আহমদ মুসা ২। আলহাজ্জ মোহাম্মদ সাখী মিয়া ৩। আলহাজ্জ আবদুস সালাম ৪। মীর্জা আবদুল খালেক ৫। জিল্লুর রহিম দুলাল, সম্পাদক নেশন টুডে	ঐ
১৯৯৮	
১। এ, ই আর খান, চলচ্চিত্র পরিচালক ২। আলহাজ্জ আবদুস সালাম	ঐ

www.pathagar.com

৩। মোঃ সালাহউদ্দীন, চীফ ফটোগ্রাফার দৈনিক ইনকিলাব ৪। আওলাদ হোসেন, সাংবাদিক দৈনিক খবর ও ছায়াছন্দ ৫। সালাহউদ্দীন, সম্পাদক পাক্ষিক ঢাকা বাণী	
১৯৯৯	
১। এ, ই আর খান ২। মনসুর উদ্দীন আহম্মদ মুসা ৩। আলহাজ আবদুস সালাম ৪। হাশেম সুফী, সাবেক মহাসচিব ঢাকা সমিতি ৫। মোঃ সালাহউদ্দীন	ঐ
২০০০ জানুয়ারি	
১। এ, ই আর খান ২। মনসুর উদ্দীন আহম্মদ মুসা ৩। আলহাজ্ব আবদুস সালাম ৪। মোঃ সালাহউদ্দীন **৫। আওলাদ হোসেন**	ঐ
২০০০ ডিসেম্বর	
১। এ, ই আর খান ২। মনসুর উদ্দীন আহম্মদ মুসা ৩। আলহাজ্ব আবদুস সালাম ৪। মোঃ সালাহউদ্দীন ৫। আওলাদ হোসেন	ঐ
২০০১	
১। এ, ই আর খান ২। মনসুর উদ্দীন আহম্মদ মুসা ৩। মোঃ সালাহ উদ্দীন ৪। সাইফুল ইসলাম, বিভাগীয় সচিব ঢাকা সমিতি ৫। আবু হুরায়রাহ, পরিচালক ডি.সি.সি. আই	ঐ

ঢাকা ঈদ আনন্দ মিছিল পরিষদের মিছিলে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মহল্লা ও সংগঠনের নাম। এসব সংগঠন ও মহল্লাবাসী ঈদ মিছিলে প্রতিবছর অংশগ্রহণ করেছে কোন কোন সংগঠন শুধুমাত্র একবার বা দুইবার মিছিলে অংশ নিয়েছে।

www.pathagar.com

এলাকাবাসী ও সংগঠন

১। সাতরওজা এলাকাবাসী
২। আগামসিহ লেন এলাকাবাসী
৩। আগামসিহ লেন-যুব কল্যাণ সংসদ
৪। বিকে গাঙ্গুলী লেন (কায়েৎটুলী ইউনিট)- ৬৯নং ওয়ার্ড
৫। কায়েৎটুলী মহল্লাবাসী
৬। আলুর বাজার এলাকাবাসী
৭। সুবেদার ঘাট এলাকাবাসী
৮। রায় সাহেব বাজার এলাকাবাসী
৯। আগাসাদেক রোড এলাকাবাসী
১০। আজগর লেন এলাকাবাসী
১১। নবাব কাটারা এলাকাবাসী
১২। জিন্নাতুল বাকিয়া ৭১ নং ওয়ার্ড
১৩। বংশাল এলাকাবাসী
১৪। মাজেদ সরদার সড়ক এলাকাবাসী
১৫। শ্যামবাজার এলাকাবাসী
১৬। প্রতিভা সংঘ চম্পাতলী
১৭। আল ইসলাম ক্লাব
১৮। সন্ত্রাস বিরোধী সংগঠন
১৯। সাত রওজা পঞ্চায়েত কমিটি
২০। কে. পি ঘোষ ষ্ট্রীট সংঘ
২১। আবদুল হাদী লেন যুব সংঘ
২২। ঢাকা সমিতি ৭৯ নং ওয়ার্ড কমিটি
২৩। ইয়ং বয়েজ ক্লাব
২৪। ডঃ শহীদুল্লাহ সংসদ
২৫। চাঁনখারপুল সমাজ কল্যাণ সমিতি
২৬। ঢাকা যুব ফাউণ্ডেশন
২৭। প্রিন্স মেডিসিন
২৮। সুরিটোলা রাইট ব্রাদার্স ক্লাব
২৯। আশার আলো সমাজ কল্যাণ সংগঠন
৩০। আগা নওয়াব দেউরী সমাজ কল্যাণ সংগঠন
৩১। মুসলিম সমাজ কল্যাণ সংঘ

www.pathagar.com

৩২। অতীত ও বর্তমান বন্ধন সমিতি
৩৩। প্রত্যাশা মাদকদ্রব্য বিরোধী সংগঠন
৩৪। প্রগতি সমাজ কল্যাণ সংঘ
৩৫। ঢাকা কালচারাল সেন্টার
৩৬। বাংলাদেশ স্পোর্টিং ক্লাব
৩৭। আগাসাদেক রোড ব্যবসায়ী সমিতি
৩৮। সিক্কাটুলী স্মরণী সংঘ
৩৯। রাইজিং স্পোর্টিং ক্লাব
৪০। হোসেনী দালান সমাজ কল্যাণ সংস্থা (পঞ্চায়েত)
৪১। নাজিরা বাজার ক্রীড়া চক্র
৪২। নাজিরা বাজার একতা উন্নয়ন সংঘ
৪৩। সৈয়দ হাসান আলী লেন ব্যবসায়ী সমিতি
৪৪। ঢাকা উইনস সমিতি
৪৫। বংশী বাজার কাশিদা পার্টির দল
৪৬। দীঘু বাবু লেন যুব সংস্থা
৪৭। ঢাকা ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার
ঢাকা শরীর চর্চা কেন্দ্র
৪৮। বাবু স্মৃতি সংঘ
৪৯। উদয়ন যুব সংঘ
৫০। শহীদুল্লাহ ইস্রাফিল স্মৃতি সংসদ
৫১। সচেতন সমাজ কল্যাণ সংঘ
৫২। ঢাকা উইমেনস ক্লাব
৫৩। ঢাকা রেঁনেসা
৫৪। মামুন সৃতি সংসদ
৫৫। নাজিমউদ্দিন রোড এলাকাবাসী
৫৬। বি কে দাস লেন এলাকাবাসী

www.pathagar.com

ঢাকা ঈদ আনন্দ মিছিল পরিষদে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা	
১৯৯৪	৩০টি দল
১৯৯৫	১৬ ”
১৯৯৬	১৮”
১৯৯৭	২০ ”
১৯৯৮	২৪ ”
১৯৯৯	১৮”
(২০০০) জানুয়ারি	১৭ ”
(২০০০) ডিসেম্বর	১৬ ”
২০০১	১১”

ঢাকা ঈদ আনন্দ মিছিল পরিষদ উল্লেখিত দল নিয়ে ঈদ আনন্দ মিছিল করে থাকে। অপরদিকে হাজারীবাগের ‘ঢাকাবাসী’ সংগঠন তাদের সদস্যদের নিয়ে মিছিল করে থাকে।

www.pathagar.com

তথ্য সূত্র

১। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ-হাকিম হাবিবুর রহমান, ঢাকা ১৯৮১ পৃঃ ১৫

২। জেমস টেলর [মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত] কোম্পানী আমলে ঢাকা, ১৯৭৮ পৃঃ ৫৯

৩। মুনতাসীর মামুন- শহর ঢাকার বিকাশ ধারা- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা-অষ্টম সংখ্যা- পৌষ-১৩৮৫

৪। আহমেদ মীর্জা খবীর - শতবর্ষের ঢাকা-১৯৯৫ ঢাকা পৃঃ ৫৮

৫। আহমেদ মীর্জা খবীর প্রাগুক্ত। পৃঃ ৫৮

৬। স্যার চার্লস ড'য়লী [অনুবাদ-শাহ মুহাম্মদ নাজমুল আলম] ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন ১৯৯১ ঢাকা পৃ ঃ ১৭

৭। মুনতাসীর মামুন-প্রাগুক্ত

৮। রফি হক পাক্ষিক প্রণোদনা সানায়ে ওয়াতানাবের স্মৃতিময় ঢাকা- সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

৯। এস এম জাহাঙ্গীর, - জাপানী তরুণীর তুলিতে ঢাকার স্মৃতি- দৈনিক ইনকিলাব, ১২ সেপ্টেম্বর - ১৯৯৭

১০। মুনতাসীর মামুন প্রাগুক্ত

১১। এফ বি ব্রাডলি বাট, [রহীম উদ্দীন সিদ্দীকি অনূদিত] প্রাচ্যের রহস্য নগরী, ঢাকা-১৯৬৫ পৃঃ ২২৮-২২৯

১২। হেনরি গ্লাসি- (ভাষান্তর মুনির রানা) বাংলাদেশের ঈদ, দৈনিক- প্রথম আলো- ৩ ডিসেম্বর ২০০২।

১৩। দেলোয়ার হাসান - বাংলাদেশের ঈদ উৎসবের ঐতিহাসিক পটভূমি দৈনিক ইত্তেফাক ৬ জানুয়ারি ২০০০

১৪। এম এ রহীম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (অনুবাদ মোঃ আসাদুজ্জামান-প্রথম খন্ড- ঢাকা ১৯৮২ পৃঃ ২৪২

১৫। অধ্যাপক কাজী দীন মুহাম্মদ, পুরনো দিনের ঢাকার ঈদ, দৈনিক ইনকিলাব ৫ ২০০০

১৬। মীর্জা নাথান- [অনুবাদ- খালেকদাদ চৌধুরী] বাহারীস্থান-ই-গায়বী পৃঃ ১০০-১০১

১৭। ডঃ আবদুল্লাহ, নওয়াব আবদুলগনি ও আহসান উল্লাহ ঢাকা-১৯৯৮ পৃঃ ১৫২

১৮। অনুপম হায়াত। নওয়াব পরিবারের ডায়রীতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি। ঢাকা ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫।

১৯। জেমস টেলর - প্রাগুক্ত

২০। অধ্যাপক মনিউর রহমান, ঈদ উৎসব দৈনিক সংগ্রাম ২৮ জানুয়ারি ১৯৯৮

www.pathagar.com

২১। এম, এ, রহীম প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৩
২২। সৈয়দ আলী আহসান, ঈদ উৎসব, দৈনিক দিনকাল ৭ জানুয়ারি ২০০০ ও সৈয়দ আলী আহসান ষাট বছর আগের ঢাকা- ২০০৩ ঢাকা- পৃঃ ৪৮।
২৩। আশরাফ-উজ-জামান, ঈদ উৎসবে সে যুগ, শৈলী ঈদ সংখ্যা ১৯৯৬
২৪। সাঈদ আহমেদ, যে ঈদ ফেলে এসেছি, দৈনিক জনকণ্ঠ ৬ এপ্রিল ১৯৯৮
২৫। লায়লা আজুর্মান্দ বানু-ঢাকাবাসীদের ভোজন বিলাস ১৯৮৯ সালে, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ
২৬। সৈয়দ আলী আহসান, ঈদের রান্না, টইটুম্বুর, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
২৭। অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-ঢাকায় প্রথম ঈদের স্মৃতি দৈনিক ইনকিলাব-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
২৮। এম এ রহীম প্রাগুপ্ত- পৃঃ ২৪৩
২৯। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, সেকালের ঢাকায় ঈদুল আযহা-দৈনিক জনকণ্ঠ, ঈদসংখ্যা ৬ এপ্রিল ১৯৯৮
৩০। হাকীম হাবিবুর রহমান [অনুবাদ মোঃ রেজাউল করিম] ঢাকা ঃ পঞ্চাশ বছর আগে-ঢাকা-১৯৯৫ পৃঃ ৪৮
৩১। আবু যোহানুর আহমদ-উনিশ শতকে ঢাকার সমাজ জীবন-ঢাকা ১৯৭৫ পৃঃ ৭৪
৩২। জেমস ওয়াইজ [অনুবাদ ফওজুল করীম] পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও পেশার বিবরণ ১ম ভাগ ঢাকা-২০০০ পৃঃ ৫৮
৩৩। আশরাফ-উজ-জামান-ঢাকাই ঈদ, পাক্ষিক অন্যদিন, ঈদ সংখ্যা ১৯৯৭
৩৪। দেখুন ঃ কে, এম, আশরাফ [অনুবাদ তপতী সেন গুপ্ত] হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্চা, ১৯৯৪ কলিকাতা পৃঃ ৪৯, ২৫২, ৮২
৩৫। ডঃ আবদুস সাত্তার, শিল্পীর তুলিতে ঈদের মিছিল, ঈদের আনন্দ, ৩ ডিসেম্বর ২০০২, দৈনিক ইনকিলাব।
৩৬। আশরাফ-উজ-জামান– প্রাগুক্ত
৩৭। আবদুল করীম [মোহাম্মদ মুহিবুল্লা ছিদ্দিক অনূদিত] মোগল রাজধানী ঢাকা ১৯৯৪ পৃঃ ৩১
৩৮। A General Guide to Dacca Museum- and IFIC Bank Calendar 1986
৩৯। মুনতাসীর মামুন ঢাকার হারিয়ে যাওয়া কামান- ঢাকা ১৯৯১ পৃঃ ৪০-৪১
৪০। Syed mohammed Taifur- Glimpess of old Dhaka- 1984- Dhaka- page-236
৪১। স্যার চালর্স ড'য়লী- প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৬
৪২। নবাব নুসরাত জং- তারীখ-ই-ঢাকা- ১৮২২ [মুহম্মদ সিদ্দিক খান অনুদিত] মাহেণও- মে ১৯৫৯, ১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

www.pathagar.com

৪৩। মুনতাসীর মামুন ঢাকা- স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, ২০০০ তৃতীয় সংস্করণ; ঢাকা। পৃঃ ১৪৭

৪৪। M. Siddiq Khan, life in old Dacca, Pakistan Quaterly, Vol-IX,1959

৪৫। ঢাকা সমিতি, স্মারক গ্রন্থ ১৯৯৫ পৃঃ ১৮৯

৪৬। ব'নজীর আহমদ পুরনো ঢাকায় ঈদের আনন্দ অগ্রপথিক মার্চ- ১৯৯৫

৪৭। হাকীম হাবিবুর রহমান প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৩

৪৮। ব'নজীর আহম্মদ প্রাগুক্ত

৪৯। ব'নজীর আহম্মদ প্রাগুক্ত

৫০। ব'নজীর আহম্মদ প্রাগুক্ত

৫১। বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায় বাংলাদেশের সংপ্রসঙ্গে, কলকাতা- পৃঃ ৩৫

৫২। নাজির হোসেন, কিংবদন্তির ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ- ১৯৯৫ ঢাকা পৃঃ ৩১৮

৫৩। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ঢাকার মিছিল- ১২ মার্চ ১৯৯৪ দৈনিক জনকণ্ঠ

৫৪। নাজির হোসেন প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৭৩, ৫৭৪

৫৫। মুনতাসীর মামুন– পুরনো ঢাকার উৎসব ও ঘর বাড়ি, ১৯৮৯ ঢাকা, পৃঃ ৪৩

৫৬। এফ বি, ব্রাডলি বার্ট, প্রাগুক্ত।

৫৭। মুনতাসীর মামুন উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা- ১৯৮৭, পৃঃ ১২২

৫৮। সরলানন্দ সেন ঢাকার চিঠি- প্রথম খন্ড, মুক্তধারা, কলিকাতা ১৯৭১ পৃঃ ১৯২

৫৯। দৈনিক আজাদ- ২৭ জুন ১৯৫২

৬০। দৈনিক আজাদ ১৬ জুন ১৯৫৩

৬১। সরলানন্দ সেন প্রাগুক্ত পৃঃ ২৭৯

৬২। ব'নজীর আহম্মদ প্রাগুক্ত

৬৩। দৈনিক ইনকিলাব- ৬ মার্চ ১৯৯৫

৬৪। দৈনিক দিনকাল ২০ ডিসেম্বর ২০০১

৬৫। দৈনিক প্রথম আলো- ৩ ডিসেম্বর ২০০২

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

এক নজরে ঈদ মিছিলের প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিষয়। শতাধিক বিষয় থেকে নব্বইটি তুলে ধরা হলো ঃ

১। টিপু সুলতানের বেশে হাতে খোলা তলোয়ার
২। রুমীটুপি পরিহিত পঞ্চায়েত সরদার
৩। বাঁশ কাগজের তৈরি হাতি ও মাহুত
৪। ট্রাকের চলমান মঞ্চে দাড়িপাল্লায় কোর্টের বিচার করার দৃশ্য।
৫। পর্দায় ঘেরা রিকশা
৬। বাউল সেজে গরুর গাড়িতে চড়ে যাওয়া
৭। বড় আকারের ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।
৮। শিম্পাঞ্জীর বেশে মুখোশ পরে।
৯। এসিড নিক্ষেপকারীদের ফাঁসি চাই।
১০। জল্লাদ বেশে হাতে তলোয়ার
১১। একটি ট্রাকের মঞ্চে, দু নেত্রী, মাইক হাতে এক নেত্রী বলেন, মানতে হবে মানতে হবে অপর নেত্রী বলেন, মানবোনা মানবো না।
১২। মদখোরকে জুতা পেটানোর দৃশ্য
১৩। যেমন খুশি তেমন সাজো, শরীরে কাদা মেখে মূর্তি হওয়া
১৪। শিশুরা বিভিন্ন সাজে, ও ব্যাণ্ড পার্টির বহর।
১৫। ফোমের তৈরি চিল
১৬। এইডস থেকে সাবধান
১৭। নবাব সেজে বিচার করার দৃশ্য পেটে কাঁঠাল বেঁধে চাবুক মারা,
১৮। নবাব আবদুল গনি, আহসানউল্লাহ ও সলিমুল্লাহ সেজে যাওয়া।
১৯। ট্রাকের ওপর ঘর তৈরি করে গ্যাস সমস্যার চিত্র তুলে ধরা।
২০। ফ্লাড লাইটে ক্রিকেট, ট্রাকের চলমান মঞ্চে
২১। বিভিন্ন দেশের পতাকা দিয়ে সাজিয়ে প্রতীকী বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা
২২। বিলুপ্ত প্রায় ঈদের মেলা
২৩। মোটর সাইকেলের বহর।
২৪। নবাব সেজে বসা অবস্থায় তার পাশে নর্তকীর নৃত্য।
২৫। ট্রাকের উপর বিয়ে বাড়ি তৈরি করে কলাগাছ বসিয়ে বধূকে গায়ে হলুদ দেয়ার দৃশ্য তার পাশে হিজরা নাচ।
২৬। মুখোশধারীর আস্ফালন
২৭। চিড়িয়াখানায় একটি ছেলেকে বাঘ হত্যা করার দৃশ্য।

www.pathagar.com

২৮। ট্রাকের ওপর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে জেলখানা তৈরি করে নবাব সিরাজদৌল্লাকে হত্যার দৃশ্য।
২৯। ঘোড়াগাড়িতে চড়ে বিলাস ভ্রমণে প্রতীকী কাদের সরদার, মতি সরদার, মাজেদ সরদার, মাওলা বকশ সরদার ও ইলিয়াস সরদার
৩০। মাজেদ সরদারের ব্যবহৃত গাড়ির প্রদর্শনী।
৩১। হাতির পিঠে নবাব সেজে বসে আশরাফী বিতরণ ও তার চার পাশে সৈন্য সামন্ত
৩২। ট্রাকের উপর পরীস্থান তৈরি করে ছোট মেয়েদের পরী সেজে নাচগান।
৩৩। মৎস্যকুমারী সেজে মাদকদ্রব্যের কুফল সমন্ধে অবহিত করা।
৩৪। অশ্বারোহী দল হাতে তলোয়ার বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়।
৩৫। নোবেল বিজয়ী ঢাকাইয়া ছেলে অমর্ত্য সেন।
৩৬। গরুগাড়ির বহর ব্যানারে লেখা আছে ঢাকার দালান কোঠা নির্মাণে আমাদের অবদান অনেক আমরাও কম খাটিনি।
৩৭। ট্রাকের চলমান মঞ্চে কাওয়ালী গানের আসর।
৩৮। ট্রাকের চলমান মঞ্চে বাউল গানের আসর।
৩৯। হাতে গীটার নিয়ে মাইকেল জ্যাকসন বেশে।
৪০। মাথার বড় চুলকে পাখির বাসা হিসেবে দেখানো।
৪১। নবাব সলিমুল্লাহর নামে বুড়ীগঙ্গা সেতু নামকরণের দাবি
৪২। বঙ্গ বাজার উচ্ছেদ করে সেখানে খেলার মাঠ চাই।
৪৩। জেলখানা ও বি.ডি আর স্থান পরিবর্তন করে রাস্তা চওড়া ও বিনোদন পার্ক নির্মাণের দাবি।
৪৪। ট্রাকে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা সাজিয়ে বন নির্মাণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের দাবি
৪৫। পশু-পাখি ধরা ও নিধন বন্ধ করা।
৪৬। যৌতুক নিয়ে কৌতুক, যৌতুকের বলি, আর কতদিন চলবে?
৪৭। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃস্টানের ধর্মীয় নেতা সেজে যাওয়ার দৃশ্য।
৪৮। আহবায়ক নাজির হোসেন নাজিরের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত ঘন্টার প্রদর্শনী
৪৯। গেঞ্জি ও ক্যাপ পরিহিত যুবক দল গেঞ্জিতে বিভিন্ন লেখা।
৫০। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মোরগ লড়াই ও ঘুড়ির প্রতিযোগিতা
৫১। বিয়ের কনের প্রতীকি দৃশ্য। ঢাকাইয়া কনের দাবী, ঢাকাইয়া এম, পি ও মেয়র পদবী চাই।

www.pathagar.com

৫২। কাশিদা গান গাওয়া।
৫৩। ঐতিহ্যবাহী হাজী বিরিয়ানী বিক্রির প্রতীক দৃশ্য
৫৪। অতীত ও বর্তমানের ঢাকা।
৫৫। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা।
৫৬। সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ চাই।
৫৭। নেতা সেজে ভোট চাওয়া।
৫৮। যানজটের, অর্থনৈতিক ও দৈনন্দিন জীবনে হয়রানি। ব্যানারে লেখা, আমাদের জীবনে প্রতিটি দিন হউক ঈদের দিনের মত যানজট মুক্ত।
৫৯। বিদ্যুতের লুকোচুরি, ও পানি সমস্যা প্লাকার্ডে লেখা ওয়াসার চেয়ারম্যান খায় বোতলের পানি, আমাদের খাওয়ায় ঘোলা পানি।
৬০। ঘোড়ার পিঠে শিশু বর ও কনে।
৬১। খাঁটি দুধ চাই।
৬২। শরীর চর্চ্চা রত কুস্তিগীর, শ্লোগান সন্ত্রাস নয় স্বাস্থ্য চাই
৬৩। ধোলাই খালের নৌকা বাইচ
৬৪। বৃটিশ আমলের হাফপ্যান্ট পরা পুলিশ
৬৫। বেহারা সেজে বর কনে নিয়ে পালকি বহনের দৃশ্য।
৬৬। জোকার ও হিজরা সং সেজে।
৬৭। কাগজ ও বাঁশ দিয়ে হাতে বানানো বিশাল আকৃতির মশা
৬৮। বায়ান্নর মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মহড়া।
৬৯। রমনা রেসকোর্সে পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ।
৭০। ভাষা আন্দোলনের মাস স্মরণে অ. আ. ক. খ লেখা বর্ণমালা প্রদর্শনী।
৭১। মানুষখেকো দৈত্য।
৭২। যানজটের কবলে মুমূর্ষু রোগী আটকে পড়া ফায়ার ব্রিগেড ও এ্যাম্বুলেন্স।
৭৩। শেয়ার বাজারে ধস ও ঘুষ খাওয়া।
৭৪। কিশোরীরা প্রজাপতির বেশে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।
৭৫। ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা।
৭৬। রিকশা থামিয়ে মহিলার গহনা ছিনতাই।
৭৭। বিশাল আকৃতির বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রদর্শনী।
৭৮। টেণ্ডার দখল।
৭৯। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ।
৮০। সাপের খেলা-বীণহাতে সাপুড়ে, ঝাপিতে রাখা খেলনা সাপ।
৮১। দরবেশ বেশে।

www.pathagar.com

৮২। হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে ভবিষ্যতের ভিক্ষুক ও ছিন্নমূল শিশুদের জীবনে ঈদ।

৮৩। গ্রামীণ বিয়ে, গরুর গাড়িতে নববধূ যাওয়ার দৃশ্য।

৮৪। ঠেলাগাড়ির চলমান মঞ্চে মহল্লা পঞ্চায়েত ঘরে বিচার সভা।

৮৫। ট্রাকের চলমান মঞ্চে নবাব সিরাজদৌল্লার দরবার।

৮৬। একটি ভ্যানগাড়িতে দুইটি জ্যান্ত ভেড়ার প্রদর্শনী, ব্যানারে লেখা ভেড়া কসাইখানায় গেলে ছাগল হয়ে আসে, মহিষ কসাইখানায় গেলে গরু হয়ে আসে।

৮৭। বুড়ীগঙ্গার তীর দখল হয়ে যাচ্ছে বুড়ীগঙ্গা বাঁচাও।

৮৮। চলচ্চিত্রের উত্তেজিত নাচ, ও অর্ধ নগ্ন শরীর দেখানো বন্ধ কর।

৮৯। কোর্ট চত্বরে একটি স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের ব্যবস্থা করা হোক।

৯০। রক্তাক্ত এক রোগীর পাশে দাঁড়ানো চিকিৎসক ও নার্সের গোলাপ বিনিময়ের দৃশ্যে, নগরীর চিকিৎসা ব্যবস্থার ম্লান পরিস্থিতি ব্যানারে লেখা- আপনারাই বলুন চিকিৎসালয় না প্রেমালয়?

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২
ঢাকা ঈদ আনন্দ মিছিল
নীতিমালা

ঢাকা গৌরবময় ঐতিহাসিক শহর। ১৬০৮ মতান্তরে ১৬১০ খৃঃ ঢাকা রাজধানী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। মোগল নবাব ইসলাম খাঁ চিশতী যখন ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন তখন ছিল রমজান মাস ও ঈদের সময়। সে সময় নবাব, জাকজমক সহকারে ঈদ উদযাপন করেছিলেন। একদিকে রাজধানী স্থাপনের আনন্দ অপর দিকে ঈদের আনন্দ। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে দেখা যায় মোগল আমল থেকেই শুরু হয়েছিল ঢাকায় ঈদের মিছিল বা ঈদ আনন্দ শোভা যাত্রা।

ঢাকার সেই সময়কার মুরব্বীরা এ মিছিলের ধারা বাহিকতা সম্মান ও গৌরবের সাথে বজায় রেখে ছিলেন। তৎকালীন সরকার দেশে সেকশন ৯২ এ-জারি করায় এ গৌরবময় ঈদ মিছিল ১৯৫৩-৫৪ সনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর তা আবার ঢাকার বিশিষ্ট সমাজ ও সংস্কৃতি সেবী মাজেদ সরদারের যোগ্য তনয় জনাব আলহাজ্ব নাজির হোসেন নাজির এবং তার শুভাকাঙ্খিদের সহযোগীতায় পুনরায় শুরু হয়েছে।

ঢাকার ঈদ মিছিল সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি নিম্নলিখিত নীতিমালা ধায্য করা হল।

নীতিমালা

(ক) ঈদ আনন্দ মিছিল গন্যমান্য সম্মানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং তারা ঈদ আনন্দ মিছিলে প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা ও মিছিলের বিচারক মন্ডলী, মনোনয়ন করিবেন।

(খ) পুরস্কার বিতরনী ও প্রধান অতিথির জন্য ঢাকার নির্বাচিত মেয়র, সংসদ সদস্যগন, ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা মনোনয়ন করা যাবে।

(গ) ঢাকার পুরনো ও নতুন শহরে বিভিন্ন ওয়ার্ড ও মহল্লাবাসীগন মিছিল আনিতে ও শরীক হইতে পারিবেন।

(ঘ) তহবিল ঃ ঈদ আনন্দ মিছিল পরিষদ তাদের সদস্য, কোন সংস্থার নগদ টাকা ও উপহার সামগ্রীর মাধ্যমে তহবিল গঠন করিবে।

(ঙ) বিচারক মন্ডলী ঃ পাঁচজন সম্মানীয় ব্যক্তি দ্বারা ঈদ মিছিলের বিচারক মন্ডলী গঠিত হবে এর মধ্যে একজন চেয়ারম্যান বা সভাপতি হিসাবে থাকিবেন।

(চ) (১) পুরস্কার প্রদান ঃ প্রদর্শনী বিষয় ভিত্তিক সংখ্যার জন্য ৪০, চ. (২) মিছিলের সাজসজ্জার জন্য ৪০, চ. (৩) শৃংখলা ১০, চ. (৪) দীর্ঘ মিছিলের জন্য ১০ নম্বর প্রদান করা হবে।

ছ. এ নীতিমালায় সময় ও যুগ সাপেক্ষে প্রয়োজনে নতুন কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন করা যাবে।

www.pathagar.com

নীতিমালা ঃ

১। কোন ধর্ম, রাজনীতি, ব্যক্তি সমালোচনা, দেশদ্রোহীতা এধরনের কোন বিষয় ঈদ মিছিলে প্রদর্শন করা যাবে না।

২। কোন জেলার আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ব্যঙ্গ বা কটাক্ষ করা যাবে না।

৩। ঢাকার প্রাচীন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পরিচ্ছন্ন ও শিল্প সম্মতরুপে তুলে ধরতে হবে যাতে মিছিলে তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। তাছাড়া পঞ্চায়েত প্রথা, বিচার, নবাবী দরবার, বিয়ে শাদী,কাশিদা ইত্যাদি প্রদর্শন করা যাবে।

৪। ঢাকার বর্তমান সমস্যা ঃ গ্যাস, বিদ্যুৎ পানি, খোলা ম্যানহোল, রাস্তা কাটা, টেলিফোন, কালো ধোঁয়া, বৃক্ষ নিধন, অবৈধ রিক্সা, যানযট, ছিনতাই, এম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড, ট্রাফিক, পরিবেশ, হকার, ইত্যাদির সমস্যা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারেন।

৫। ঢাকার সমস্যা সমাধানের নতুন কোন প্রস্তাব সাদরে গ্রহনীয়।

৬। মুসলিম দেশ বা মুসলমানদের ঐতিহ্য যেমন তাজমহল, কাবাঘর, খ্যাতিমান কোন মসজিদ বা ঐতিহাসিক নির্দশন ইত্যাদি প্রদর্শন করা যাবে। এ ছাড়া মুসলিম দেশের সমস্যা দেখানো যেতে পারে। তবে বিতর্কিত কোন কিছু প্রদর্শন করা যাবে না।

৭। সময় ও যুগ সাপেক্ষে প্রয়োজনে এ নীতিমালায় কিছু পরিবর্তন ও নতুন কিছু সংযোজন করা যাবে।

(আলহাজ্ব নাজির হোসেন নাজির)
আহবায়ক
উর্ধতম সহ-সভাপতি
ঢাকা মহানগরী সমিতি

(এ ই, আর, খান মামা)
সভাপতি বিচারক মন্ডলী
উপদেষ্টা
ঢাকা মহানগরী সমিতি

---

* নীতিমালা প্রনয়ন করেন চলচ্চিত্র পরিচালক এ ই. আর. খান, ও অত্র গ্রন্থকার রফিকুল ইসলাম রফিক। ২০০০ সালের ঈদ মিছিলের একটি সভায় ঢাকা সমিতির মহাসচিব এস এম নাজিম উদ্দীন খসড়া নীতিমালাটি পাঠ করে শোনান।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রফিকুল ইসলাম রফিক সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধিৎসু লেখক। বিশেষ করে ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিকথা অন্বেষণে ব্রত থেকে গবেষণা করে যাচ্ছেন।

ঢাকাই তাঁর জন্মমৃত্তিকা ফলে ঢাকার সঙ্গে তার নাড়ির যোগ রয়েছে। ঢাকার প্রাচীন সংস্কৃতি এবং জীবনাচারনের ইতিবৃত্ত নিয়ে দেশের প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকায় লিখে যাচ্ছেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত "বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি" ঢাকা বিষয়ক ছড়াগ্রন্থ। এ গ্রন্থে ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বর্তমান জীবনাচরন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ২০০৬ সালে 'ঢাকা শহরে উর্দু সংস্কৃতি' ও 'ঢাকা নিয়ে নানা কথা' শিরোনামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

যুগে যুগে ঢাকার ঈদমিছিল লেখকের দীর্ঘ গবেষণার ফসল। এখানে ঢাকার জন্মলগ্নের ইতিহাসের পাশাপাশি, ঢাকাইয়াদের উৎসবাদি বিশেষ করে ঐতিহাসিক ঈদ উদ্‌যাপনের আনন্দ উৎসবের তথ্যনির্ভর বর্ণনা রয়েছে। নিঃসন্দেহে আমাদের আহরিত ইতিহাসে একটি বড় প্রাপ্তি হিসাবে এ গ্রন্থটি যোগ্য হবে। লেখক তাঁর সাবলিল বর্ণনায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করেছেন। শৈশবে চিত্রাংকন চর্চা ও পরবর্তী সময়ে গীটার বাদনায় কিছুদিন মনোনিবেশ করেন। আবৃত্তি কোর্সে সনদ ও পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক বেশ ক'টা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত।

লেখালেখির প্রধান মাধ্যম ইতিহাস সম্মানী প্রবন্ধ। তবে শিশু সাহিত্য রচনাতেও হাতযশ আছে। ঢাকার ওপর তার আরো কয়েকটি গবেষনাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশের পথে।

- প্রকাশক